প্রথম পর্ব ঃ

(ইতিহাস পর্ব)

।। প্রথম পর্ব ।।

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যে 'আন্দোলন' অভিধাটির তাৎপর্য নির্ণয়

পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের ইতিহাস ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে 'আন্দোলন' অভিধাটিকে অনবরত নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণভাবে 'আন্দোলন' শব্দটি খুবই ব্যাপক। রাষ্ট্র ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই, শিল্প সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। 'আন্দোলন' শব্দটি এখন বিপ্লব, বিক্ষোভ, সংগ্রাম, রীতি, ধারা ইত্যাদি নানা শব্দের সঙ্গে একাত্ম ও একার্থক হয়ে গেছে। মুখ্যতঃ ইংরেজীর 'movement' শব্দের অনুসরণে আন্দোলন কথাটির প্রয়োগ হচ্ছে। movement, কথাটির যে অর্থ এখানে মুখ্য, তার মূল কথা কোনো কিছুর পরিবর্তন ঘটানোর জন্য জনজাগরণ বা তার সমবেত প্রচেষ্টা। অর্থাৎ প্রতিবাদ ও পরিবর্তন দুই-ই আন্দোলনের শর্ত। এই প্রতিবাদ বহু লোকের সম্মিলিত ক্রিয়া। সমষ্টিগত জিগির। সেক্ষেত্রে অস্থিরতা, বা উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রেরণা। প্রেরণার দুটি দিক ঃ স্বতস্ফূর্ততা এবং স্বতস্ফূর্ততার সংঘটন। অনেক সময় যুগমানসের মধ্যে প্রতিবাদের বীজ থেকে যায়। তাকে সংগঠিত রূপ দিতে হয় কোনো সংগঠককে। সংগঠকই নতুন ভাবনা নিয়ে যুগমানসকে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন। এভাবে আন্দোলন ব্যাপারটি ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ঐতিহাসিক কালের প্রক্রিয়াকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। শুধু রাজনীতির দিক থেকে নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি আধ্যাত্মিক দিক থেকেও তা ঘটতে পারে। আসলে, কোনো একটি ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলতে চলতে মানুষের কাছে উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। অন্তত কিছু সংখ্যক মানুষের মনে হয় যে, উক্ত ব্যবস্থা আর উপযুক্ত নয়, তাকে পাল্টানো প্রয়োজন। তবে প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষেও বহু লোক থেকে যায়। যেহেতু সব ব্যবস্থাই একটা প্রতিষ্ঠান, তাই যে কোনো ব্যবস্থার পক্ষেই লোকবলের অভাব হয় না। প্রতিষ্ঠান সর্বদাই একটা শক্তি। স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তনশীল ও স্থিতাবস্থার সমর্থকদের মধ্যে একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংঘাতের শুরু থেকে পরিণতি পর্যন্ত অবস্থাটাকেই আন্দোলনের চেহারায় দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ার যে কোনো অংশকেই আন্দোলন বলা যায়। পরিবর্তনকামীরা প্রথমে করেন প্রতিবাদ। প্রতিবাদের এই স্তরে থাকতে পারে যুক্তি ও তত্ত্ব; থাকতে পারে শুধুই হৈ চৈ, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। যাই থাকুক, এটি হচ্ছে প্রচারধর্মিতার স্তর। দ্বিতীয় স্তরে পাই, আলোচনার স্তর। সাহিত্য শিল্পের ব্যাপার হলে, সৃষ্টিকর্মের নমুনা পেশ হতে থাকে। তৃতীয় স্তরে ক্ষমতা দখল। সৃজনক্রিয়ার ব্যাপার হলে, পুরনো ধারাকে সরিয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। রসগ্রহীতাদের স্বীকৃতি অর্জনের প্রয়াস। সুতরাং যে কোনো আন্দোলনই

একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া বিশেষ। তা দ্বন্দ্ব, রূপান্তর ও সৃজনশীলতার এক সামগ্রিক নির্মাণ। লক্ষ করবার যে, একটি বিশেষ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় যে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা পেল, তারও ভবিতব্য পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিকতার মতই; যেহেতু আবার নতুন কোনো আন্দোলনের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা তাকেও একদিন অপ্রাসঙ্গিক করে দেবে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের আন্দোলনের কিছু গুণগত ও মাত্রাগত প্রভেদ রয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধারার মধ্যে রক্তক্ষয়ী ব্যাপার ঘটতে পারে, নন্দনক্ষেত্রের আন্দোলনে তা অকল্পনীয়। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক আন্দোলন আর এখন বিশুদ্ধ তত্ত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত হচ্ছে না। সেদিন অবলুপ্ত। যে কোনো দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে এখন একাধিক বিদেশী রাষ্ট্রের সরাসরি অর্থ, অস্ত্র ও সমর্থন নির্ভরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একটা দায়সারা ভাব। ভারতের মতো দেশে অনেকগুলো ভিন্ন মতাদর্শী রাজনৈতিক দল একটি যুক্ত ফোরামের অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে আন্দোলন ব্যাপারটি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বস্তুত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আজ প্রতিষ্ঠান এমন সর্বগ্রাসী ও সূক্ষ্ম যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্ভাবনা তিরোহিত। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে একটা ব্যবস্থা পাল্টে গেলে পুরানো কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। আমূল পরিবর্তন ঘটে। যেমন, রাশিয়ায়। পূর্বে ছিল জারের আমল, তারপরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় পুরানো সামাজিক কাঠামোই সেখানে পাল্টে গেছে। সাহিত্য আন্দোলনের উপর এই সব রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব থেকে যায়; কিন্তু দুইয়ের প্রকৃতি আলাদা। একমাত্র সাহিত্য বা শিল্পের আন্দোলনের ধারাগুলির মধ্যেই পূর্ববর্তী ধারণাগুলির কিছু কিছু পরবর্তী যুগের আন্দোলনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে যায়। একমাত্র সাহিত্য শিল্পের আন্দোলনই দ্রুত আন্তর্জাতিক আন্দোলনের চেহারা লাভ করতে পারে। তাই সাহিত্যের আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বের নানাদেশ ও নানাযুগের রচনাকর্মের একটি বিশেষ ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে।

সেদিক থেকে, নানা দেশের, নানা যুগের সাহিত্য আন্দোলনগুলিকে নিয়ে আলোচনা করলে 'সাহিত্য আন্দোলনের' সীমারেখা ও গুরুত্বটিকে বোঝা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে নানা দেশে এত ধরনের সাহিত্য আন্দোলন হয়েছে যে, তার সবগুলির আলোচনা সম্ভব নয়। আলোচনার পরিসর ও প্রাসঙ্গিকতা স্মরণে রেখে তাই এখানে প্রধান প্রধান ক'টি ধারাকে নির্বাচিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, আন্দোলনগুলির বৈভিন্ন্য কোথাও বিষয়ের, কোথাও মতাদর্শের, কোথাও বা রূপকল্পের। যদিও সমস্ত, আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সাহিত্যকে

এগিয়ে নিয়ে গেছে। ঐশ্বর্যশালী করেছে। কখনও কবি-লেখকেরা নিজেরাই তাঁদের অভিনব সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে আন্দোলন নামে অভিহিত করেছেন; কখনও বা সমালোচকেরা, ঐতিহাসিকেরা নব্যরীতির সাহিত্য চর্চাকে আন্দোলন নামে স্বীকার করেছেন। সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে 'আন্দোলন' অভিধাটি কে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন জানা যায়নি। এও বলা সম্ভব নয় যে, প্রকৃতই প্রথম সাহিত্য আন্দোলন কোনটি ?

প্রাথমিকভাবে একথা বলা যায় যে, পৃথিবীর সমস্ত শিল্প-সাহিত্যকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল অবশ্যই রেনেশাঁসের অভিঘাত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনষ্টানটিনোপলের পতনের পর ইতালিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও মনীষার যে মহা অভ্যুত্থান ঘটেছিল — তার প্রভাব প্রায় সমগ্র বিশ্বে পড়েছে। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের অবসানে মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তের নবীন আলো জেগে উঠেছিল। এর আগে, প্রাচীন ভারতে, গ্রীসে অনেকগুলি উন্নতমানের সাহিত্যকীর্তি লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালের বিশ্বসাহিত্যে এগুলির গভীর প্রভাব কার্যকর হয়েছিল। প্রাচীন বিশ্বের ঐ সমস্ত সাহিত্যের, প্রকাশভঙ্গীই পরে ধ্রুপদীরীতির সাহিত্য বলে পরিগণিত হয়েছে। ক্লাসিসিজম' - এর তত্ত্বটি ধীরে ধীরে সাহিত্য আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে। ক্লাসিসিজম, রেনেশাঁস এগুলিকে সাহিত্য আন্দোলন না বলা গেলেও, সাহিত্যের রূপান্তর ও পরিণতির দিক থেকে সাহিত্য আন্দোলনের সমানধর্মা বলেই মনে হয়। লক্ষণীয়, ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের প্রসার সতেরো ও আঠারো শতক পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে লক্ষ করা গেছে। যদিও তাকে 'ক্লাসিক' বলা হয় নি। বলা হয়েছে, নিও ক্লাসিক। তাও উনিশ শতকে গিয়ে। Hugh Honour অবশ্য 'নিও ক্লাসিসিজম'কে বলেছেন, true style ; তাকে আন্দোলন বলেন নি।[১]

তবে নিও ক্লাসিসিজমের পর যখন তাত্ত্বিকভাবে রোম্যান্টিসিজমের আবির্ভাব ঘটল তখন 'আন্দোলন' অভিধাটি সাহিত্য প্রসঙ্গে যেন স্পষ্টতা লাভ করল। রোম্যান্টিসিজম ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে যে ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল ও প্রভাবিত করেছিল তাতে এটিকে আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করতে আর কোনো অসুবিধে রইল না। সাধারণভাবে ১৭৯৮ সালকেই এই আন্দোলনের সূচনা হিসাবে ধরা হয়। তবে আঠারো শতকের জীবনাদর্শ, আঙ্গিকবিন্যাস, পরিমিতিবোধ, যুক্তি ও শৃঙ্খলানুগত শিল্প সাহিত্যের বিরুদ্ধে কবিতায় টমসন, গ্রে, বার্নস, ব্লেক; উপন্যাসে ওয়ালপোল, র‍্যাডক্লিফ, লিউস তাঁদের প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন। রোম্যান্সের আভাস তাঁদের রচনাতেই প্রথম দেখা দিয়েছিল। আঠারো শতকেই সত্তরের দশকে জার্মানীতে হার্ডার, শিলার ও গ্যাটের নেতৃত্বে যে storm and stress আন্দোলন হয়েছিল তাতে রোম্যান্টিক আন্দোলনের ধারাটি পুষ্ট হয়েছিল। এছাড়া ফরাসী বিপ্লবের ও মধ্যযুগের রোম্যান্সের প্রভাবও

রোম্যান্টিক আন্দোলনের উপর ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, বায়রণ ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আবাহন মন্ত্র দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগের রোম্যান্স কোলরিজের 'Kubla Khan', কীটসের 'The Eve of St. Agnes', স্কটের উপন্যাসবলীতে স্পষ্টতই অনুভব করা যায়। যাই হোক, রোম্যান্টিক আন্দোলন ইংল্যান্ডে শুধু জনপ্রিয়তা ও প্রসার লাভ করেনি, ইংরেজী সাহিত্যকেই একটা নবজীবন দান করেছে। বাংলাভাষায় রোম্যান্টিকতা আন্দোলন হিসেবে গড়ে না উঠলেও - রবীন্দ্রনাথ একাই তাঁর সহস্রদ্যুতি রোম্যান্টিক কল্পনায় একটি যুগান্তর আনয়ন করেছেন।

সাহিত্য-তাত্ত্বিকেরা রোম্যান্টিক আন্দোলনকে ক্লাসিক ঐতিহ্যের বিপরীত রূপে চিহ্নিত করেছেন। একই ভঙ্গীতে বাস্তববাদী আন্দোলনকে রোম্যান্টিক আন্দোলনের বিপ্রতীপ রূপে লক্ষ্য করেছেন। ব্যাসদেবের মহাভারত বা চৌদ্দ শতকের চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেলস্' নয়; বালজাকের 'La comedie Humaine' (১৮৩০), ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারি' (১৮৫৭), জর্জ ইলিয়টের 'মিডলমার্চ' (১৮৭১-৭২) ইত্যাদিকেই বাস্তববাদী আন্দোলনের সূচনাফসল হিসেবে ধরা হয়। ১৮৫৭ সালে champflenry র 'Le Realism' প্রকাশ পেলে এই আন্দোলন তাত্ত্বিক ভূমিটি লাভ করে। আবার ১৯৪০ এবং ১৯৫০'র দিকে ইতালির উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে 'নিও রিয়ালিষ্ট' নামে আরেকটি সাহিত্য আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল।

বাস্তববাদী আন্দোলনের পরিণতি লাভ ঘটে 'ন্যাচারালিজম' ও 'সোস্যালিষ্ট রিয়ালিজমে।' প্রথমটিতে বলা হয় যে, মানুষ প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতির বাইরে তার কোনো অধ্যাত্ম সত্তা নেই। মানুষ নামক উন্নত জীবটির চরিত্র ও ভাগ্য বংশগতি ও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এডমন্ড ও জুলে গঁকুর, জোলা,মোঁপাসা, ষ্ট্রিন্ডবার্গ - এই ধারার বিখ্যাত লেখক। বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লখনীয়। 'সোস্যালিষ্ট রিয়ালিজমের' আদর্শ হল সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দান। মার্কসীয় দর্শনকে এই সাহিত্যাদর্শ আত্মস্থ করতে চায়। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার ম্যাকসিম গর্কি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সাহিত্য ও শিল্পের সব ক্ষেত্রে এক সময় এই আন্দোলন সারা বিশ্বে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাবে গড়ে উঠেছিল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন। 'সোস্যালিষ্ট রিয়ালিজম' বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আন্দোলনটি 'কলাকৈবল্যবাদে'র বিরোধিতা করেছিল। ১৮৩৫ সালে গঁতিয়ে শিল্পের উপযোগিতাবিহীনতার কথা বলেছিলেন। সেই থেকে কলাকৈবল্যবাদের শুরু। এই 'কলাকৈবল্যবাদ' থেকেই অবক্ষয়বাদে'র জন্ম যার ফসল বোদলেয়ার এবং র‍্যাঁবো। উনিশ শতকের অবক্ষয়বাদী আন্দোলন বিশ শতকের ইংল্যান্ডে অ্যাংরি ইয়ংম্যান মুভমেন্ট' এবং আমেরিকায় 'বিট জেনারেশন মুভমেন্টে রূপ পায়। আমাদের আলোচ্য হাংরি জেনারেশন আন্দোলনেও যাদের কিছু প্রভাব রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, বোদলেয়ার শুধু অবক্ষয়বাদী আন্দোলনের সূচনা করেন নি, কবিতায় তিনিই প্রথম প্রতীকবাদের ইশারা দিয়েছিলেন। ২. জ মরেস অবক্ষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে নিজের মত মিশিয়ে যে প্রতীকবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন তাতে ভের্লেন, মালার্মে, র‍্যাঁবো, লাফার্গ থেকে ভালেরি, রিলকে, ইয়েটস, মেটারলিঙ্ক এলিয়ট এমনকি রবীন্দ্রনাথও বহু অবদান রেখেছেন। একালে বাংলাভাষায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও প্রতীকবাদী আন্দোলনের ঋণ গ্রহণ করেছেন।

রিয়ালিষ্ট ও ন্যাচারালিষ্ট আন্দোলনের প্রকরণে অনীহা এবং প্রতীকবাদী প্রবণতার বহিরাবরণকে অস্বীকার করে একশপ্রেশনিষ্ট আন্দোলনের প্রকাশ। বের্গসঁ এবং ফ্রয়েড এ আন্দোলনের দার্শনিক প্রেক্ষিকাটির জনক। ১৯১০ থেকে ১৯২৫'র বছরগুলিতে জার্মান ছাড়াও ইউরোপের নানা স্থানে এ আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছিল। গেয়র্গ, ব্রেশট, কাফকা, এলিয়ট এই ধারার উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাঁ পল সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শন ও আন্দোলনকে সারা বিশ্বে তীব্রতা দান করেন। যদিও কিয়ের্কগার্দের 'Either' গ্রন্থে ১৮৪৩ সালেই এর সূচনা হয়েছিল। সার্ত্রের উপন্যাস, নাটক ছাড়াও, দস্তেয়ভস্কি, কাম্যু, কাফকা, বেকেট ও হ্যেল্ডরলিন রচনাবলীতে এই দর্শনের প্রভাব রয়েছে। বাংলাভাষায় জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য ও কবিতায় প্রথম সার্থকভাবে অস্তিত্ববাদের রূপায়ণ চোখে পড়ে।

অ্যাবসার্ড আন্দোলনটিকে একদিক থেকে অস্তিত্ববাদী আন্দোলনেরই শাখা বলা যায়। অস্তিত্ববাদের আত্মানুসন্ধানের ব্যাপারটি এখানে নেই, আছে অস্তিত্বের নিরর্থকতার বোধ। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বিখ্যাত ফসল স্যামুয়েল বেকেটের "ওয়েটিং ফর গোডো।" এছাড়াও হ্যারণ্ড পিন্টার, জাঁ জেনে, আয়েনেস্কো প্রভৃতি নাট্যকারেরা বিখ্যাত। বাংলা ভাষায় এই ধারায় বাদল সরকার অগ্রগণ্য। তাছাড়া বার্ণিক রায়েরও কিছু নাটক আছে।

ইমেজিষ্ট আন্দোলনও একটি আধুনিকবাদী আন্দোলন। একদিক থেকে তা ফরাসী প্রতীকবাদী আন্দোলনেরই সম্প্রসারণ। ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত এই আন্দোলনের মুখ্য বিস্তার। T. E. Hulme এ আন্দোলনের পুরোধা। পাউন্ড ও এলিয়ট অনেকদিন পর্যন্ত এই আন্দোলনে ছিলেন। (পরে পাউন্ড vorticism আন্দোলনে যোগ দেন।) বাংলা কবিতার ত্রিশের দশক এই আন্দোলন থেকে গভীর প্রেরণা পেয়েছিল।

ইমপ্রেশনিষ্ট আন্দোলন একদিক থেকে, একসপ্রেশনিষ্ট আন্দোলনের বিপরীত, প্রথমটি 'বস্তুজগতের রূপ, দ্বিতীয়টি 'বস্তুজগতের উপর শিল্পীর মানসিক চিন্তাভাবনার রূপ। অন্যদিকে এই আন্দোলন ইমেজিষ্ট আন্দোলনেরও উল্টো। ইমেজিষ্টরা চিত্রকল্প নির্মাণকে গুরুত্ব দেন। ইমপ্রেশনিষ্টরা গুরুত্ব দেন প্রকৃতির যথাথথ প্রতিভাসকে। সুতরাং পরিহার করেন প্রতীকী তির্যকতা। ইয়েটস, এলিয়টের কবিতায় এ আন্দোলনের ছাপ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ ও বিনয় মজুমদারের কবিতায় এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়।

সানাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকায় ডাডা আন্দোলন তীব্র আকার নিয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতা রুমাণীয় কবি ত্রিস্তান জারা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জার্মান কবি হুগো বল, হ্যানস আর্প প্রমুখ। প্রথাগত যা কিছু তাকে ধ্বংস করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ। শুধু প্রচলিত জীবন ও শিল্পবোধ নয়, বুদ্ধি ও অন্বয়নির্ভর প্রকাশরীতিকেও তাঁরা ভাঙতে চেয়েছিলেন। অবচেতনের স্বৈরাচারের প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। এই আন্দোলনের তাপ প্যরিস থেকে নিউ ইয়র্কে পৌছে গিয়েছিল। ১৯২২ সালে এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় পরাবাস্তববাদী আন্দোলন। ডাডাবাদী ব্রেতঁ, লুই আরাগঁ ছাড়া পল এলুয়ারও এই আন্দোলনের হোতা। এই দুটি আন্দোলনের অন্তর্বিরোধকে অরুণ মিত্র ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে ঃ "দাদা'র দৃষ্টিতে শুধু ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা এবং সমাজিপতিদের শঠতা ও দুর্বৃত্ততা। কিন্তু স্যুররেয়ালিষ্ট দৃষ্টিসীমায় আসে লেনিন অনুপ্রাণিত রুশ বিপ্লব, ফ্রয়েডের মনঃ সমীক্ষণতত্ত্ব, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এইসব ইতিবাচক দিক।"[৪]. কিছুটা হলেও একথা সত্য যে, ডাডাবাদী আন্দোলনের মধ্যে সাহিত্য শিল্পের অনেকগুলি ধারা এসে মিশে গিয়েছে। বাংলাসাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ে ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যার কিছু লেখায় পরাবাস্তববাদের ছাপ মুদ্রিত।

বিশ্বের এই সব সাহিত্য আন্দোলনগুলির এই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা থেকে একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, সাহিত্যে আন্দোলনের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনের তরঙ্গ ও উত্তাপ ব্যতীত বিশ্বসাহিত্যের ভান্ডারটি বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণই হয়তো হতে পারত না। গতানুগতিক সাহিত্যের বিবর্ণতা-ই প্রাপ্তি হত মানুষের। যেমন বাংলাভাষার মধ্যযুগে ঘটেছে। মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী সাহিত্যের পৌনঃপৌণিকতা শত শত বৎসর ধরে চলেছে। এটা ঠিক যে, ব্যক্তিপ্রতিভার অসামান্যতাও সাহিত্যের অভিনবত্ব সূচনা করে। কিন্তু ব্যক্তিপ্রতিভা আকস্মিক বলে - তার জন্যে কোনো ভাষাকে বহু কাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়। অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে অগ্রগতিতে সে সাহিতের ভাষা পিছিয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া, বড় প্রতিভাও যে কোনো ভাবেই সাহিত্য আন্দোলনের ফলশ্রুতি। বিশেষত আধুনিক যুগে। শেকসপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথের কথা এ

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেননা, শেকসপীয়ার কোনো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি ইউরোপের নবজাগরণ আন্দোলনেরই সন্তান। রিভাইভাল যুগের টমাস মুর থেকে স্পেনসার, এলিজাবেথান যুগের মার্লো, লিলি সবাই শেকসপীয়ারের পূর্ণতা লাভের সহায়ক ছিলেন। একই ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। ইংরেজী সাহিত্যে যদি রোম্যান্টিক আন্দোলনের ঐ রকম ব্যাপ্তি ও সিদ্ধি না ঘটত তাহলে আমরা কোন রবীন্দ্রনাথকে পেতাম ? রবীন্দ্রনাথ শুধু ইউরোপীয় রোম্যান্টিক আন্দোলনের ফসল নন, তিনি বাংলাসাহিত্যের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনেরও কারণ। বাঙালী নবীন সাহিত্যিকদের তিনি যেমন আরাধ্য ছিলেন, তেমনই ছিলেন আক্রমণেরও স্থল। তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভাকে অতিক্রম করে নতুন কিছু সৃষ্টির জন্যই বাংলাসাহিত্যে নানা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

সাহিত্য আন্দোলনের আরও একটি বড় তাৎপর্য এই যে, প্রায় প্রতিটি আন্দোলন, প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। একটি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার যেমন অন্য আন্দোলনের জন্ম, তেমনই একটি আন্দোলন অন্যটির পরিপূরক। অধিকাংশ আন্দোলনই সাহিত্যের একটি শাখারূপকেই আশ্রয় করে জাত হলেও অন্য শাখাকেও সম পরিমাণে প্রভাবিত করে। এমনকি সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতিকেও। সুতরাং সাহিত্যে 'আন্দোলন' ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী।

তথ্যসূত্র

১. Hugh, Honour, Neo classicism, Penguin Books, Britain, 1981, Introduction, P. 14

২. Baudelaire, Penguin Books, Britain 1980, correspondences, Page - 43.

৩. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, সাহিত্যের রূপরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা -১৪৬

৪. অরুণ মিত্র, আরাগঁ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১, ভূমিকা, পৃ ঃ ২

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় সাহিত্য আন্দোলনের পূর্বসূত্র

পৃথিবীর প্রথম সাহিত্য আন্দোলন কোনটি তার যেমন নির্দিষ্ট কোনো উত্তর নেই, তেমনই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আন্দোলনের নির্ধারণও বিতর্কের অবকাশ সূচিত করতে পারে। এমনিতে বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছরের। তার মধ্যে আধুনিকতার আবির্ভাব কিঞ্চিদধিক একশ বছর। প্রধানত মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব থেকে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জন্ম পশ্চিমী সাহিত্যের অনেক পরে এবং ঐ সব সাহিত্যের প্রভাবে। মধুসূদন বঙ্কিমের হাতে আমাদের সাহিত্যের ভিত যখন গড়ে উঠল, তখন এ দেশে একদিকে প্রাচীন পন্থীদের সঙ্গে এই আধুনিকমনা নবীনদের বিরোধ ঘটে, অন্যদিকে এঁদের প্রভাবে এক একটা ধারার প্রবর্তন হয়। মধুসূদনের ধারায় হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পথে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের সাহিত্যচর্চা লক্ষ্য করা যায়। তবে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে গোষ্ঠীগত সৃজন প্রক্রিয়ায় সাহিত্যের অভ্যস্ত পথকে অস্বীকার করে নতুন দিশার সন্ধান দেবার মধ্যে। কিন্তু মধুসূদন, বঙ্কিম যেমন আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব, তাঁদের অনুসারকেরাও তাই। যৌথ ভিত্তিতে কেউই সাহিত্য রচনা করেননি, দলও গড়েননি। তবু একটা প্রশ্ন থাকে। ক্লাসিসিজমের মধ্যে যেমন সাহিত্য আন্দোলনের কিছু গুণাবলী নিহিত থেকে যায়, তেমনই যে কোনো সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসের পিছনে যুগের অন্যান্য উপাদানও অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। আজ যখন বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিককার আন্দোলন হিসবে 'সবুজ পত্র' আন্দোলন বা 'কল্লোল' আন্দোলনকে' চিহ্নিত করা হয় তখন বুঝতে হয় এদেরও একটা হয়ে ওঠার ইতিহাস আছে।

ইতালীর রেনেশাঁস যেমন ইউরোপে শিল্প-সংস্কৃতিতে একটা প্রবল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, উনিশ শতকের নবজাগ্রত বঙ্গদেশেও তেমনই একটা উত্থান ঘটেছিল। সে সময় এদেশে একটি নবীন শিক্ষিত বাঙালী সমাজ জেগে উঠেছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, ভূদেব, রবীন্দ্রনাথ সবাই তারই ফসল। প্রতিবাদ, অসহিষ্ণুতা, সংস্কারমুক্তি, বিজ্ঞানমনস্কতা, অনুসন্ধিৎসা, বিচারশীলতা, আবেগ, যুক্তিপ্রবণতা, জাতীয়তাবোধ, পাশ্চাত্যমুখিতা সবই একসঙ্গে প্রবল হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞানের পঠন পাঠনই হল এর মূল কারণ। এই নতুন জিজ্ঞাসাবোধ ছাড়া বাঙালীর এই নতুন সাহিত্য গড়ে উঠতে পারত না। এই নব জিজ্ঞাসা ও নবজাগরণই আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচনার প্রেরণা। ধর্মীয়, সামাজিক ও

রাজনৈতিক আন্দোলন বাঙালী-মনে নানা ধরণের যুক্তিবোধ, জাগিয়ে দিয়েছিল; আর তা থেকে শুধু প্রচারমূলক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ মাত্র নয়, রসসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছিল। তার মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চিন্তক ও ভাবুক লোকদের প্রতিবাদী চেতনা কাজ করেছিল। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের আন্দোলনে শুধু ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদী আন্দোলনগুলি নয়, দেশজ এই সামাজিক আন্দোলনগুলিরও প্রভাব ছিল। মধুসূদনের কাব্যে ও প্রহসনে, রামনারায়ণ তর্করত্ন ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে, বঙ্কিমের উপন্যাস ও প্রবন্ধে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের আন্দোলনগুলি'র বাহক হয়েছিল নানা পত্র পত্রিকা। আর পত্র পত্রিকার এই বিতর্কপ্রবণ স্বভাব, সাহসী ভূমিকা উনিশ শতকের শুরুতেই দেখা গিয়েছিল। ১৮১৮ সালের 'দিগদর্শন' থেকে ১৮৪৩ সালের 'তত্ত্ববোধিনী' সকলের ক্ষেত্রেরই এ কথা সত্য। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন,

> এই সময়ে মধ্যে বাংলা সাময়িক পত্র (সাপ্তাহিক, বারত্রয়িক, দ্বিসাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও দৈনিক) এমন একটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে যে, শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, বাঙালীর সামাজিক আন্দোলন, শিক্ষাক্রম, ধর্ম ও উপধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়। অবশ্য 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রভৃতি ইয়ংবেঙ্গল পরিচালিত পত্রিকায় রাজনৈতিক সমালোচনা ও আন্দোলন ক্রমে দানা বেঁধে উঠলেও সাধারণ বাঙালী এ ব্যাপারে আকর্ষণ বোধ করেনি।[২]।

এগুলির কোনোটাই সাহিত্য আন্দোলন নয় ঠিকই, কিন্তু উনিশ শতকের কবিতা, প্রহসন ও প্রবন্ধসাহিত্যের উপর এগুলির গভীর প্রভাব আছে। উপরন্তু বাঙালির পত্র পত্রিকা যে সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে পারে - সেই ইশারাও তারা রেখে গিয়েছিল। ১৮৩১'র 'সংবাদপ্রভাকর' এবং ১৮৭২'র 'বঙ্গদর্শন' দু'জন সাহিত্যিক দ্বারা সম্পাদিত হলেও সেখানেও সমাজ ও ধর্মবিশ্বাস প্রাধান্য পায়। আরও পরে - 'সবুজপত্রে'র পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল সে গুলি সবই ছিল নিস্তরঙ্গ। তাই যে রোম্যান্টিসিজম্ ইংরেজী সাহিত্যে আন্দোলন হিসেবে প্রকাশলাভ করে, বাংলাসাহিত্য তার আগমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতাবলীর প্রকাশ 'পূর্ণিমা, 'অবোধবন্ধু', 'আর্যদর্শন' প্রভৃতি সাধারণ পত্রিকায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বপ্লাবী সাহিত্যিকের প্রকাশ যেসব পত্রিকায় যথা 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'সাধনা' 'হিতবাদী' 'ভারতী' ইত্যাদি সেগুলিও কোনোটাই সে অর্থে অভিনব ধারার নয়। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাময়িক পত্র

পত্রিকাগুলি যেমন নানাবিধ আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল ঐ শতকের বা পরের শতকেরও অনেক সাহিত্য পত্রিকা সেরূপ ভাবে সাহিত্য আন্দোলনের বাহক হয়ে উঠতে পারেনি। তাই উনিশ ও বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যে বিপুল উত্থান রবীন্দ্রনাথের হাতে ঘটেছিল, তা এদেশের কোনো সাহিত্য আন্দোলনজাত নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় রোম্যান্টিক আন্দোলনেরই উত্তর সাধক কিন্তু তাঁর মধ্যে ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনাও বড় কম নেই। যাই হোক, রবীন্দ্র প্রতিভার বিশালতা ও ঔজ্জ্বল্য বাঙালী কবি সাহিত্যিকদের কিছুদিন মোহমুগ্ধ রাখলেও, কেউ কেউ তা থেকে মুক্ত হবারও চেষ্টা করলেন। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের বিচারে দেখা যায় যে, অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে মধুসূদনই প্রথম আঘাত করেছিলেন। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের চরিত্রগুলির নব মূল্যায়নে সেদিন তিনি নৈরাজ্যবাদী বলেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। তাঁর বিদ্রোহ ছিল সামন্ত ভূমিব্যবস্থা, প্রাচীন প্রজন্মের দুরাচার ও নবীন প্রজন্মের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধেও। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহ্যের প্রতি পক্ষপাত দেখালেও বাঙালী সমাজ ও জাতির সমালোচনা করেছিলেন নানা প্রবন্ধে ও নকসায়। রবীন্দ্রনাথও ব্রিটিশ সরকারের সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি। এই ব্যাপারগুলোও বাঙালীর মনকে সেদিন গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সুতরাং একটা আন্দোলনের জন্য (তা সাহিত্য বা রাজনীতি যারই হোক না কেন) যে মানসিকতার দরকার, উনিশ শতকের শুরু থেকেই তার নির্মাণের প্রক্রিয়া নানাভাবে শুরু হয়েছিল। তাই ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্র' পত্রিকা ইতিহাসের এক অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। স্মরণীয় যে, 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পিছনে রবীন্দ্রনাথের প্রণোদনা থাকলেও 'সবুজ পত্র' প্রমথ চৌধুরীর ভাবাদর্শকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কারণ তিনিই ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। এমনকি 'সবুজ পত্র' রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতিকেও পাল্টে দিয়েছে। তিনি চলিত ভাষাকে 'সবুজ পত্র' থেকেই সাহিত্যের বাহন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, যে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কিছুদিন আগে লিখেছিলেন,

> আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজ পত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথ নাথ যে এই পত্রকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নূতন প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীয় মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। 'সবুজ পত্রে' সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা করা প্রমথর কৃতিত্ব।[৩]

'সবুজ পত্রে'র নতুন ভূমিকা অবশ্য ছিল বহুবিধ। যার ফলে বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম সুনির্দিষ্ট মাইলস্টোন হিসেবে তাকে ধার উচিত। 'সবুজ পত্র'ই প্রথম বাংলাভাষার সাহিত্য

পত্রিকা যা তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধী পত্রিকা গোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে পেরেছে। বিশেষ করে 'নারায়ণ' পত্রিকার কথা বলতেই হয়। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র স্নেহধন্য হলেও তাঁর অন্ধ স্তাবকতা করেনি 'সবুজ পত্র'। আবার 'ভারতী'র মতো পত্রিকাও অনেকখানি পাল্টে গেছে 'সবুজ পত্র'র প্রভাবে। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগী হিসেবে 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠী' সাহিত্যে যে মুক্তি চেতনা ও গতিধর্মের প্রয়োগ সাধনায় একান্ত আগ্রহী হয়েছিলেন, ভারতীগোষ্ঠীর... লেখকেরা সেই প্রয়াসকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে আনুকূল্য করলেন। প্রাচীনপন্থী সমাজ ও পরিবারের একঘেঁয়ে নীতি নিয়ম সম্মত কাহিনীর ধারা বর্জন করে এঁরা গল্প উপন্যাসে নূতনত্ব আনার চেষ্টা করলেন।"[৪] কিন্তু 'সবুজপত্র'র ভাবাদর্শটি কী যার জন্য সে একটা ভাষার সাহিত্য আন্দোলনের পথ প্রদর্শক হলো। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তারুণ্যের জয়গান এবং চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি। যুক্তি ও বুদ্ধি, মননের নেশা ও তার্কিকতা, জড়তা ও মেদবর্জিত ভাষা এবং আধুনিক রুচির প্রতিষ্ঠা পত্রিকাটিকে এক অনন্যতা দান করল। এই একটি পত্রিকা যেখানে ছবি বাদ দেওয়া হল, বিজ্ঞাপন বাদ দেওয়া হল, কিন্তু তাতে পত্রিকার আকর্ষণ, এতটুকু কমল না। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে প্রমথবাবু পত্রিকাটির আবির্ভাব ঘটালেন। এর আগে অন্য কোনো বাংলা সাহিত্য পত্রিকার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার প্রকাশ ঘটেনি। 'সবুজ পত্রে'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'মুখপত্র' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে প্রথমবাবু লিখেছিলেন, "দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙালী জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'একটা নতুন কিছু করো।' সেই পরামর্শ অনুসারেই যে আমরা, একখানি নতুন মাসিক পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না।"[৫] অর্থাৎ নতুনত্বের ব্যাপারটি রয়েছে কিন্তু তা একমাত্র নয়। এর পরে প্রমথবাবু সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হবে সম-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ। এখানে একটা জোটবদ্ধতার ব্যাপার এসেই যাচ্ছে। আরও বলেছেন, "মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্‌ছল।"[৬] যে জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্যের বিকাশ তা "মানুষের দৈনন্দিন জীবন নয়।" মানুষের প্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করার কথা বলেছেন প্রমথবাবু। হয়তো সে জন্যেই মুখপত্রের নীচে 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' শ্লোকটি মুদ্রিত হত। প্রাণকে জাগানোর ব্রতে প্রমথবাবু ইউরোপকে বরণ করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, —

> ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন, মনের গায়ে হাত বুলোয় না, ধাক্কা মারে। ইউরোপের স্পর্শে আমরা আর কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি। অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে - সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব সাহিত্যের সৃষ্টি।[৭]

প্রমথবাবু আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সাহিত্যকে সখের বিলাস থেকে মুক্ত করে ব্যবসা বাণিজ্যের অঙ্গ করতে হবে। তাঁর মতে, "অব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোনো কাজই যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না একথা সর্বলোক বিদিত।' আর অব্যবসায়িকতার কারণেই আগাছার মতো সাহিত্য রচিত হয়। তিনি আত্মসংযমের কথা বলেছিলেন, লেখক মনকে সংহত ও স্বচ্ছ করতে বলেছেন। দেশজ চেতনা ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করতে বলেছেন। তাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চেয়ে 'ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কে প্রমথবাবু অধিক পক্ষপাত দেখিয়েছেন। ইউরোপীয় চেতনাকে এভাবে স্বাজাত্যবোধের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন।

'সবুজ পত্রে'র আদর্শের মধ্যে বাঙালীত্ব ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে। অসাম্প্রদায়িক মুক্তমনা বাঙালীত্ব ও বাঙালীর প্রাণাবেগ গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি লিখেছেন,

> আমরা তাই দেশী কি বিলাতী পাথরে গড়া সরস্বতীর মূতির পরিবর্তে, বাঙ্গালোর কাব্য মন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরে কোনও গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই, আর বাতাস চাই।[৮]

প্রমথবাবুই প্রথম জানান যে, সাহিত্যকর্ম শুধু ব্যক্তির একটি সৃজনশীল কর্ম নয়, তা ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক অনিবার্যতাও। তাই 'সবুজ পত্রে'র প্রকাশ "একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য।"[৯] ইংরেজী শিক্ষার কারণেই বাঙালীর জীবনে এই নতুনত্ব এসে পড়েছিল। প্রমথচৌধুরীই প্রথম সাহিত্যকে ভাবাতিশয্য ও 'চুটকি' থেকে মননশীল শিল্পরূপে উত্তীর্ণ করবার কথা বললেন। 'সবুজ পত্রে'র প্রথম সংখ্যার 'মুখপত্রটি তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া চলিত গদ্যকে 'সবুজ পত্রের' মুখ্য বাহন করায় এবং রবীন্দ্রনাথ এখানে চলিত গদ্য অবলম্বনে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস রচনা করায় বাংলা সাহিত্যে একটি যুগান্তরের সূচনা হল। প্রমথ চৌধুরী যে ভাবে 'সবুজ পত্র' পত্রিকার পরিকল্পনা ও লক্ষগুলিকে 'মুখপত্রে' বিন্যস্ত করেছেন - সেই পদ্ধতিই প্রমাণ করে যে, 'সবুজ পত্র' বাংলাভাষা ও সাহিত্যে একটি আন্দোলনের স্রষ্টা। ডঃ বিজিতকুমার দত্ত বলেছেন, "সবুজপত্র এমন আকারে প্রকাশিত হল যা ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন নেই। সবুজ মলাটের মাঝখানে সবৃন্ত তালপাতার গাঢ় ছায়াছবি। সুকুমার সেনের ভাষায় এই মলাট 'উদ্ধত, অদম্য, চিরহরিৎ, বাঙ্গালোদেশের চিরপরিচিত, চিরকালীন প্রাণের সরল সবল উদ্দণ্ড ঊর্ধ্বাভিমুখিতার চিহ্ন এই অভিনব তালধ্বজ।' সবুজপত্রে ছবি নেই। সাইজ অর্ধ ফুলসক্যাপ। সবুজপত্র যথার্থ লিটল ম্যাগাজিন।'[১০]

'সবুজপত্রে'র নিজের গুণ ও ক্ষমতা যেমন তাকে একটি সৃজনশীল আন্দোলনের পথে নিয়ে গেছে তেমনই সমকালীন বিশ্বের নানা ঘটনা ধারাও তার সঙ্গী হয়েছে। যেমন, ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্রে'র আত্মপ্রকাশ তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও শুরু। এর অব্যবহিত আগে ১৯০৫ সালে সংগঠিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ১৯১৭ সালে ঘটল রুশ বিপ্লব। ১৯২০ সালে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি।[১১] সুতরাং 'সবুজ পত্র' পত্রিকার প্রকাশ ও সমৃদ্ধির কাল প্রবাহও পত্রিকার আন্দোলনের সহযোগী ছিল। যেহেতু লেখকদের মনকে নাড়া দেবার পক্ষে ঘটনাগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরীর অনেক লেখায় ঐ সব ঘটনার বিশেষ করে যুদ্ধের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে আছে। যেমন, 'নানা কথা' গ্রন্থের 'ইউরোপে কুরুক্ষেত্র' (১৩২১) ও বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ (১৩২১) প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। যে কোনো সাহিত্য আন্দোলনের একটি বড় কাজ হল একটি নিজস্ব লেখক গোষ্ঠী গড়ে তোলা। 'সবুজ পত্র' সে ব্যাপারে খুবই সার্থক। এঁদের মধ্যে প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবীচৌধুরী ও অতুল চন্দ্র গুপ্ত খুবই নাম করেছিলেন। এছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যয়, বিশ্বপতি চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকেও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'সবুজপত্র' পত্রিকার পর বাংলা সাহিত্যে যে পত্রিকাটি সর্বাপেক্ষা আলোড়ন তুলেছিল তার নাম 'কল্লোল'। সাহিত্য আন্দোলনের গুণ ঐ পত্রিকাটিতে 'সবুজ পত্র'র চেয়েও ছিল বেশী। ১৯২৩ সালে দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব। প্রথম আর্বিভাবে তাকে গল্পের পত্রিকা হিসাবে আখ্যাত করা হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই তা সবধরণের লেখকের মুখপত্র হয়ে উঠল। 'সবুজ পত্র' বলেছিল মুক্তির কথা, আর 'কল্লোল' নিয়ে এলো উদ্দামতা। 'সবুজ পত্র' রবীন্দ্রনাথের আশিস্ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, 'কল্লোল' এগোতে চাইল রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে, তাঁকে আক্রমণ করে। 'সবুজ পত্র' আশ্রয় নিয়েছিল বুদ্ধির, 'কল্লোল' নিল প্যাশনের। তাই সমকালীন ঘটনাবলীর উত্তেজনা 'সবুজ পত্র' প্রতিফলিত হয়নি, কিন্তু 'কল্লোলে' তার প্রত্যক্ষ ছায়া পড়েছে। যুগের সার্বিক সংকট 'কল্লোল' সাহিত্যের আকাশ আবিল করে দিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় এক দশকের মাথায় 'কল্লোল' এর আবির্ভাব। কারণ ১৯১৪ থেকে ১৯২৩'র কাল ব্যবধান নয় বছর। ফলে যুদ্ধোত্তর কালের সংশয় পীড়িত মূল্যবোধ কোনো নির্মাণ নয় এক ভাঙনেরই চিহ্ন রেখে গেল কল্লোলের পাতায় পাতায়। উনিশ শতকের যে মূল্যবোধকে আশ্রয় করে প্রমথ চৌধুরীরা বুদ্ধিবাদের জাগরণ চেয়েছিলেন তা কল্লোলের কালে গুরুত্বহীন হয়ে গেল। একদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনা (১৯০৫-১১), ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মজফরপুর হত্যাকান্ড উপলক্ষে প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা ও ক্ষুদিরামের মৃত্যুদন্ড যেমন বিদ্রোহের সংবেদনা জাগাল,

তেমনই অন্যদিকে মহাযুদ্ধের ক্লিন্নতা ও ১৯১৫'র সহিংস আন্দোলনে বাঘাযতীনের পরাজয় দেশের যুবসমাজের চিত্তে এক গভীর হতাশার জন্ম দিল। যুদ্ধজনিত আর্থিক সংকট খাদ্যাভাব, বেকারসমস্যা প্রভৃতিকে আরও বাড়িয়ে তুলল। 'কল্লোল'এর লেখকেরা প্রায় সবাই এই সময়ের ফসল। সুতরাং অস্থিরতা, নৈরাশ্য, ক্ষোভ এবং অবিশ্বাস 'কল্লোল'-এর লেখকদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু মানসিকতায় কল্লোলীয়রা যেহেতু রোম্যান্টিক, তাই বাস্তবের রূঢ়তাকে অস্বীকার করে তাঁরা এক নতুন মূল্যবোধ রচনার চেষ্টা করেছিলেন। 'কল্লোল' ধারার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'কল্লোলের সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোম্যান্টিসিজমের মোহ মাখানো।' বাংলা ভাষার সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসে 'কল্লোল'কে যে অনেকখানি স্থান ছেড়ে দিতে হয় তার আরও একটা বড় কারণ তাঁদের সংগঠন শক্তি। 'কল্লোল'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রিকা যা অন্যান্য পত্রিকা গোষ্ঠীর লেখকদেরও তাঁদের ছত্রছায়ায় এনেছিল। এমনকি অন্য পত্রিকার সম্পাদকদেরও। ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৯২৬ সালে কলকাতায় 'কালিকলম' এবং ১৯২৭ সালে ঢাকায় 'প্রগতি' পত্রিকা বার হয়। সুকুমার সেন 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'কে ''কল্লোলের কচিশাখা''[১২] বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, কল্লোলেরই তিন ভাগ হওয়ার কথা। এরকম বলার কারণ, 'কল্লোলে'র নিম্নবিত্ত ও ধূলিমলিন জীবনচিত্রণ 'কালিকলমের'র শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনালেখ্য রচনা থেকে পৃথক নয়। অথবা অজিত দও ও বুদ্ধদেব বসুর রোম্যান্টিকতা ও যৌবধর্ম 'প্রগতি'র পাতায় যে ভাবে রূপায়িত - তাও 'কল্লোলেরই একটি প্রবণতা বিশেষ। শুধু তাই নয়, 'কালিকলমে'র সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র বা 'প্রগতি'র সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু পরেও তাঁদের অনেক ভালো লেখা 'কল্লোলে' দিয়েছেন। সেকালের সব নবীন লেখকই তাঁদের সেরা লেখাটি 'কল্লোল' পত্রিকায় দিতেন। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল' উপন্যাসটি ১৩৩৫ সালের অষ্টমসংখ্যা 'কল্লোল' থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বেরিয়েছে বুদ্ধদেব বসুর একাধিক গল্প। 'কল্লোল' যত বিচিত্রধরণের দিকপাল আধুনিক লেখককে তার ছত্রছায়ায় আনতে পেরেছিল, তেমনটি আর কোনো পত্রিকাই পারেনি। দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, মনীন্দ্রলাল বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, মনীঘটক (যুবনাশ্ব), বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, নৃপেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অজিত কুমার দত্ত প্রমুখ। এঁদের অনেকেই হয়তো 'কল্লোল'এ খুব কম লিখেছেন, বা পরে অন্যত্র সরে গেছেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা 'কল্লোল'-এর জন্যই হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন,

"সে আড্ডায় (কল্লোলে'র আড্ডায়) সকলেই আসতেন - নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্যাল, হেমেন্দ্রকুমার, মনীন্দ্রলাল, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) ধূর্জটিপ্রসাদ, কালিদাস নাগ নলিনী সরকার (গায়ক), জসীমুদ্দিন, হেমচন্দ্র বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, সরোজ কুমার রায় চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে ও আরো অনেক। ... উপরে যাঁদের নামকরলুম তাঁরা প্রায় সকলেই অবশ্য 'কল্লোলে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং বেশির ভাগেরই খ্যাতির প্রথম সোপানও 'কল্লোল'। তাছাড়া আমাদের আড্ডায় যাঁদের কখনো দেখিনি, কিংবা কমই দেখেছি, এমন অনেকের লেখাও প্রথম 'কল্লোল'এ বেরোয়, এবং 'কল্লোলে'র সূত্রেই তাঁদের নাম বাইরে ছড়ায় - যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত ও জীবনানন্দ দাশ। প্রবীনদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বাগচী, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নরেন্দ্র দেবের রচনা 'কল্লোল' এ প্রায় বেরুতো - রাধারাণী দেবীও নিয়মিত লিখতেন - এবং এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, তৎকালীন তরুণ লেখকসমাজে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত ও মোহিতলালের প্রতিপত্তির জন্য 'কল্লোল'-ই প্রধানত দায়ী। ... নজরুলের গজল গানগুলি 'কল্লোলে'ই প্রথম বেরোয়, আর 'কল্লোল' আপিসের তক্তাপোষে বসে নজরুল যখন ওসব গান গেয়েছেন তখনও তা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েনি। বস্তুত, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের যে কটি যুবক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের সকলেরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন ছিলো 'কল্লোল'।"[১৩]

অবশ্যই তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর, জীবনানন্দ, বা যতীন্দ্রনাথকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক বলা যাবে না। কারণ 'কল্লোলের দৃষ্টিভঙ্গী বা বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা সাহিত্যের আদর্শ বলে মনে নেননি। কিন্তু 'কল্লোলে'র প্রভাব তাঁদের উপর অবশ্যই কমবেশী পড়েছিল।

আসলে, 'কল্লোল' পত্রিকা যে বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলনের সূচনা করতে পেরেছিল তার মূলে তাঁদের একটা বিশেষ জীবনবোধ ও প্রকাশভঙ্গীর ব্যাপার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সূচনা ও 'সবুজ পত্রে'র ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে তারই অবচেতনিক গূঢ়তা সেখানে ধূলিধূসর জীবনের সংরক্ততা নেই। 'কল্লোল' সেই অভাব দূর করতে চেয়েছে। প্রেমেন্দ্র ও

অচিন্ত্যের গল্প ও উপন্যাসে কলকাতা নগরীর যে ক্লেদ ও নিষ্ঠুরতা কিংবা শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক শ্রমিক জীবনের যে আলেখ্য নির্মাণ তা এ কথাই স্মরণ করায়। যৌনমনস্তত্ত্ব ও দারিদ্রের অভিজ্ঞতা দুটোকেই মেলাতে চাইলেন কল্লোলীয়রা। লক্ষণীয় যে, ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে ফ্রয়েড়ের' "The interpretation of Dreams" "The psychology of Everyday life," "on Dreams" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বার হয়ে মনোবিকলন তত্ত্বের সাড়া সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে ফেলেছে। ভারতে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাও দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কারণ, রাশিয়ায় লেলিন সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ইতিমধ্যে সাকার করে তুলেছেন। সুতরাং কল্লোলীয়রা সাহিত্যে এই দুটি ব্যাপারকেই উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল', সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"[১৪] অচিন্ত্যকুমারের এরূপ বলার পিছনে, 'কল্লোলে'র বিষয় ও বিন্যাসটি চিহ্নিত হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লেদ ও সৌন্দর্যের বিনষ্টি 'কল্লোলে' প্রতিফলিত। এমনকি সমাজের ভিন্ন শ্রেণীরও ছবি চলে আসছে। উল্লেখ করা যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাখনি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের জীবন ভিত্তিক গল্প 'মা', 'মরণ বরণ', ঝমরু প্রভৃতি গল্প। পতিতাদের দারিদ্র্য ও ক্লিন্নতা নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দাসের 'মরুর বাতাস', 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', সুবোধ দাশগুপ্তের 'মহামানব' প্রভৃতি গল্প। জগদীশ গুপ্ত প্রান্ত-বাসিনীর জীবন তুলে ধরেছেন 'যে যার কাজে' গল্পে বা যুবনাশ্ব বস্তিজীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'তে। এগুলি সবই 'কল্লোলে' মুদ্রিত। বাস্তবতার এই নতুন ধরণে অনেক সময় 'কল্লোল' এর লেখকরা বিভ্রান্তও হয়েছিলেন। তাই গোর্কি এবং ন্যুট হামসুনকে মেলানোর কথাও তাঁদের মাথায় এসেছিল। ফরাসী প্রতীকীবাদীদেরও গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন তাঁরা।[১৪] লক্ষণীয়, একদিকে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকট, অন্যদিকে বিবাহ-অতিরিক্ত যৌনসম্পর্ক এবং বোহেমিয়ান জীবনের প্রতি টান যুগপৎ 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে। এসব কারণেই দেশ, জাতি, সমাজ, প্রথা সব কিছুকে প্রবলভাবে অস্বীকারের প্রবণতা তাঁদের লেখায় মেলে। তাই যেন হয়ে ওঠে প্রতিবাদ, আঘাত ও বিদ্রোহ। এই দৃষ্টিভঙ্গীগুলির মধ্যে নিহিত সীমাবদ্ধতা হয়তো সমালোচনা যোগ্য কিন্তু তাঁরা যে বাংলা সাহিত্যকে সেকালে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলেন — তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অধ্যাপক গোপিকানাথ চৌধুরী দেখিয়েছেন, কল্লোলগোষ্ঠী সাধরণভাবে ন'টি গুণ আমাদের সাহিত্যে সঞ্চার করেছে।[১৫] যথা ১. নবীনতার সাধনা ২. প্রচলিত সমাজের ধর্ম, নীতি ও প্রেমের আদর্শবাদী ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ৩. কথা সাহিত্যের বিষয়সীমার প্রসার ৪. বাস্তবতার নতুন মাত্রা দান - যৌনতা ও প্রকৃতিবাদের প্রতিষ্ঠা ৫. বাস্তবতার সঙ্গে রোম্যান্টিকতার সংমিশ্রণ ৬.

কথাসাহিত্য গণচেতনার প্রসার — পথের ভিখারী থেকে বস্তিবাসী, কুলিকামিন মধ্যবিত্ত বেকার যুবক, সবাই। ৭. পঙ্কিল নগর চেতনা প্রধানত কলকাতার ক্লিন্ন নগরজীবন ৮. আঞ্চলিক জীবন বোধ -কয়লাকুঠির জীবন। ৯. প্রকাশভঙ্গীর ভিন্নতা। ১০. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, "কল্লোলে'র বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে, ভঙ্গী ও আঙ্গিকের চেহারায়।"[১৬]. প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প ও উপন্যাস, অচিন্ত্য, প্রবোধ ও বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলি তার বড় প্রমাণ। যাইহোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা সাহিত্য 'কল্লোল' পত্রিকা ও ঐ গোষ্ঠীর লেখকেরাই প্রথম স্পষ্টরেখ আন্দোলনটির সূচনা করেছিলেন। এবং 'কল্লোল'এর কাছে প্রেরণা নিয়েই বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী আন্দোলনগুলি জন্ম নিয়েছে। মন এবং মননের সমস্তরকম অচলায়তন 'কল্লোল'-ই প্রথম ভেঙ্গে দিয়েছিল।

'কল্লোল'-এর পর উল্লেখযোগ্য বাংলা সাময়িক পত্রিকা 'পরিচয়' ১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনার প্রকাশ পায়। 'কল্লোল'-এর তীব্র দ্রোহচেতনার পাশে 'পরিচয়' কে প্রথম দেখায় চোখে লাগে না। 'পরিচয়ে'র হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যে, নতুন যুগ সৃষ্টির দাবি 'পরিচয়' কোনোদিন করেনি।"[১৭] আসলে, 'পরিচয়' মননশীলতা ও প্রগতির আরেক বার্তা নিয়ে এসেছিল আমাদের সাহিত্যে। তার প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচীর মধ্যে বিষয় গাম্ভীর্য ও বৈচিত্র্য দুইই ছিল। বিষয়সূচী এরকম ঃ

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ	-	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
বৌদ্ধধর্মের দান	-	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
কাব্যের মুক্তি	-	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত
রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা	-	শ্রীসুশোভন সরকার
বিজ্ঞানের সংকট	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
শিল্পীর ব্যথা	-	শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রেমপত্র	-	শ্রীধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
হিন্দুস্থানী ও বাংলাগান	-	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়
কবিতাগুচ্ছ	-	শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী
		শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
		শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীবুদ্ধদেব বসু
		বিচ্ছেদ (মারসেল প্রুস্ত) শ্রীবিষ্ণু দে
		বীরবলের পত্র - বীরবল

189629
26 FEB 2007

NBU DARJEELING

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅশোক নাথ বেদান্ততীর্থ, শ্রীধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যয়, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য, শ্রীমনীন্দ্র লাল বসু - ইত্যাদি।

১৫৪ পাতার ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটিতে ৩৬ পাতা বরাদ্দ হয়েছিল 'পুস্তক পরিচয় বিভাগের জন্য। সে যুগে তা ছিল বিরল ঘটনা। 'পরিচয়' প্রথম সমকালীন সাহিত্য সমালোচনাকে এত গুরুত্ব দিয়েছিল। সুতরাং পরিচয়ের সাহসের ধাত ছিল অন্যরকম। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর নীরেন্দ্রনাথ রায় সেকালে তাঁর মার্কসবাদী সমালোচনারীতি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বহু বাঙালী লেখককেই আক্রমণ করে সোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। 'পরিচয়' বাংলা সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনার যে একটি নতুন দিগন্ত প্রসারিত করেছিল তা স্বীকার করতে হয়। এই একটি পত্রিকা প্রোপাগান্ডা ও দলাদলি ছাড়াই একটি প্রগতিশীল অথচ মুক্ত মননের সাহিত্যাদর্শ নির্মাণ করেছিল। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হিরণকুমার সান্যাল, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা, সুশোভন সরকার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সরোজ আচার্য প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। প্রথমে 'কল্লোলে' লিখলেও বিষ্ণু দে'কে 'পরিচয়' গোষ্ঠীরই অন্তর্গত করতে হবে। কারণ, এখানে এসেই তিনি পাল্টে যান, পরিণত হন। সাহিত্য আন্দোলনের লক্ষ যেহেতু শুধু হৈ চৈ করা নয়, বরং একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা তাই স্বভাবে স্থিতধী 'পরিচয়' অবশ্যই একটি আন্দোলনের স্রষ্টা। আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনে 'পরিচয়'-এর পুরোধা ভূমিকাকে স্বীকার করতে হবে। মার্কসবাদী সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনার ধারাটিও পরিচয়'-ই আমাদের ভাষার প্রবর্তন করেছে। 'সবুজ পত্র' থেকে 'পরিচয়' পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে আন্দোলন তাতে একক ব্যক্তি নয়, আন্দোলন সংগঠিত করার পিছনে গোষ্ঠীবদ্ধ প্রয়াস-ই লক্ষ্য করা যায়।

'পরিচয়'-এর পরে 'কবিতা' পত্রিকার আবির্ভাবে এই ঐতিহ্যটি পাল্টে গেল। ১৯৩৫ 'এর অক্টোবরে কবি বুদ্ধদেব বসু একক প্রচেষ্টায় ছয় আনা মূল্যের যে কবিতা ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বার করলেন, সেখানে কবিতা মনোনয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণে অন্য কারুর কোনো ভূমিকা রইল না। সুতরাং সাহিত্য আন্দোলন পরিচালনায় একক ব্যক্তি প্রাধান্যের যুগ সূচিত হল। 'কল্লোল'-এর উদ্দীপনা, 'প্রগতি' সম্পাদনার অভিজ্ঞতা - দুই-ই 'কবিতা' পত্রিকার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। 'সবুজ পত্র' সাহায্য করেছিল গদ্য সাহিত্যের, বিশেষত কথাসাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে, 'কল্লোল' কথা সাহিত্য এবং কবিতা উভয়কেই, 'পরিচয়' প্রধানত কবিতা ও সমালোচনা সাহিত্যকে; আর 'কবিতা' শুধু কবিতার জন্য আন্দোলন। যদিও এ আন্দোলনের অর্থাৎ আধুনিক কবিতার আন্দোলনের ভূমিকাটি 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকায় আগেই নির্মিত হয়ে গিয়েছিল তবুও তাকে স্বাধীনভাবে স্বতস্ফূর্ততা ও

গতিবেগ দিল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা। আন্দোলনের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী কোনো বিশেষ ভাবাদর্শ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে 'কবিতা' পত্রিকা প্রচার করেনি। 'সাহিত্য পত্রে' বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন,

> শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিতা ছাপা হবে - নামজাদা বা অনামজাদা যার লেখাই হোক না কেন - প্রসাধন বৈশিষ্ট্য থাকবে - এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য এইটুকুর বেশী আমার ছিল না। ... আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিল কবিতার পত্রিকা রূপে নয়, কবিদের পত্রিকারূপে। অর্থাৎ প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা - এমনকি কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিলো না; সমকালীন সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম।[১৮]

ঐ একই নিবন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন,

> সমিতি করে, মন্ত্রণাসভা ডেকে, কিংবা লিমিটেড কোম্পানি স্থাপন করে কখনো সত্যিকার লিটল ম্যাগাজিন সম্ভব হয় না। এর আসল কথা স্বতঃস্ফূর্তি, বাইরে থেকে বানিয়ে তোলা যাবেনা একে, ভেতর থেকে হয়ে ওঠা চাই। এই হয়ে ওঠার প্রেরণা রূপে থাকে কখনো কখনো একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের বল, কখনো কোনো লেখক গোষ্ঠীর মিলিত প্রভাব।[১৯]

'কবিতা' পত্রিকা অবশ্য একক ব্যক্তির বলেই আধুনিক বাংলা কাব্যের আন্দোলনের অন্যতম শরিক হয়ে উঠতে পেরেছিল। পত্রিকাটির আবির্ভাব লগ্নে এডওয়ার্ড টমসন 'দ্য টাইম লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট-এ" এর প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখে মন্তব্য করেছিলেন, 'They represent a movement which will change the thought of Bengal, and through Bengal that of India."[২০] 'বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে' কবিতা'র প্রথম প্রকাশকে কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিগ্‌বিজয়ের অভিযান' বলে উল্লেখ করেছেন।'[২১] কবিতা পত্রিকা তার অঘোষিত আন্দোলনে আরও যে একটি বড় কাজ করেছিল তা হল 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র একটি সংকলন প্রকাশ। এর সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হল এমন দু'জন ব্যক্তিকে যাঁরা কবি নন এবং যাঁদের দু'জনের মধ্যে আদর্শ ও রুচির বিস্তর পার্থক্য শুধু নয় বুদ্ধদেবের সঙ্গেও তাঁদের সম্মিলিত পার্থক্য একই। অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরী যথার্থই বলেছেন যে, "আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পাদনের ভার সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শের দুইজনের উপর ন্যস্ত হওয়াতে সমগ্রভাবে 'কবিতা'র আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে।"[২২] অবশ্য

পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব স্বয়ং সংকলনটির রূপান্তর করেছিলেন। 'কবিতা' - আন্দোলনের প্রভাব এমন হয়েছিল যে, তিরিশের দশকের এমন কোনো কবিকে পাওয়া যায়নি যিনি কখনও 'কবিতা'য় লেখেন নি। এমনকি জীবনানন্দ, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তীর যে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা তার পিছনে 'কবিতা'-রই অবদান সর্বাধিক। 'কবিতা' - পত্রিকার আর একটি বিশিষ্টতা হচ্ছে সে কখনও রবীন্দ্র দ্রোহিতার আশ্রয় নেয়নি। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত কাব্য সংকলনের যে সমালোচনা বুদ্ধদেব করেছিলেন তাতে কবি নির্বাচন নিয়ে আপত্তি থাকলেও রবীন্দ্রকাব্য বা সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কোনো বিরূপতা দেখা যায় নি। 'কবিতা' পত্রিকা শুধু আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে ওঠেনি, তা একই সঙ্গে আধুনিক কবিতার পাঠককেও তৈরী করেছে। শুধু সমকালের সব ধরণের কবিতার মুদ্রণ নয়, সে সম্পর্কে নতুন ধরণের আলোচনাও সুন্দরভাবে 'কবিতা' - পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। পত্রিকার প্রথম বর্ষেই প্রকাশ পেয়েছিল বুদ্ধদেবের দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'কবিতার দুর্বোধ্যতা' ও 'কবিতার পাঠক'। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কবিতাকেও আধুনিকের দৃষ্টি দিয়ে এ পত্রিকায় আলোচনা করা হত। 'কবিতা' পত্রিকাই বোধ হয় একমাত্র প্রথম যা মনে রেখেছিল হুইটম্যানের ধারণা "To have great poets there must be great audiences too "।[২৩] এসব কারণেই পচিশ বছর ধরে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে একটি যুগান্তকারী ব্যাপার। বুদ্ধদেব বসু ঠিকই বলেছিলেন, "বাংলা ভাষার কবিতা লেখার কাজটি হয়ে উঠছে শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের উপায় নয়, রীতিমতো একটি 'আন্দোলন', যার মুখপাত্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে 'কবিতা' পত্রিকা"।[২৪]

'কবিতা' - আন্দোলনের পর বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী যে দিক পরিবর্তনের প্রয়াসটি দেখা যায় তা আবর্তিত হয়েছিল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। মাঝখানে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' ও দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, তরুণ মিত্র এবং আলোক সরকারের সম্পাদনায় 'শতভিষা' (১৯৫১) কিছুটা কবিতার আন্দোলন সংগঠিত করেছিল ঠিকই কিন্তু তার প্রভাব অচিরেই ক্ষীণতা পেয়েছে। বিশেষ করে 'শতভিষা' বিশুদ্ধ কবিতার আন্দোলন বলে যা চালাতে চেয়েছিল তাকে বৃহত্তর পাঠকসমাজ বর্জন করেছিল। তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সময়ের উল্টো স্রোতে নিজেদের বাইবার চেষ্টা। 'শতভিষা'র তেত্রিশতম সংকলনে 'সম্পাদকীয়'তে জানানো হয়েছে, "তিরিশের দশকের কবিদের যৌনকাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, অতিরিক্ত সমাজভাবনা, তরল কাব্যময়তা ইত্যাদি আপাত লক্ষণগুলি যে আর ব্যবহৃত হবার নয় এ সত্য অভ্রান্ত জেনে কবিতার মুক্তির জন্য 'শতভিষা' প্রয়োজন অনুভব করেছিল নতুন পথ সন্ধানের।"[২৫] দেখা গেল ১৯৫৩ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'কৃত্তিবাস' নামে যে পত্রিকাটি বাংলা কবিতার ধারাটিকে আমূল পাল্টে দিল তা ত্রিশের কবিদেরই অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যকে তীব্রতা দিয়েছে। শুধু 'শতভিষা' কথিত

সমাজভাবনার ব্যাপারটিই অনুপস্থিত। 'কৃত্তিবাস' কে ঘোষণা করা হয়েছিল 'বাঙলা দেশের তরুণতম কবিদের মুখপত্র' বলে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, ''আসল কথা হল তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দল গড়ে ওঠা।''[২৬] 'কবিতা' আন্দোলনের লক্ষ ছিল আধুনিক কবিতাকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া। কবিতার একটি রুচিশীল পরিশীলিত আঙ্গিক দান করা। 'কৃত্তিবাস' - আন্দোলনের লক্ষ হল কবিতাকে জনপ্রিয় করা, তাকে বাণিজ্যের সামগ্রীতে পরিণত করা। আবেগ, সৌন্দর্য ও স্বতস্ফূর্তির মেলবন্ধন ঘটানো। যৌবনের সমস্তরকম স্বাভাবিকতাকে মেনে নিয়েই। 'এই দশকের কবিতা'র ভূমিকায় 'কৃত্তিবাসে'র শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাই লিখেছিলেন, 'আধুনিক কালের পৃথিবীর তাবৎ কাব্যাদর্শকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে কেবলমাত্র কবিতার জন্য বেঁচে থাকা ও সকল সময় কবিতার মধ্যে অবস্থানের সংকল্প বুঝি বা নূতন।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার জন্য কিছু খেলা, শুধু ... / কবিতার জন্য এত রক্তপাত।''[২৭] কবিতা লিখে তিনি পনটিয়াক গাড়ি, স্কচ, সাদা ঘোড়া ইত্যাদি সবই চেয়েছিলেন।[২৮] সমস্ত রকম মূল্যবোধকে সজোড়ে ভাঙার রোম্যান্টিক আহ্বান 'কৃত্তিবাসী'দের মধ্যে দেখা গেল। এঁরা শুধু কবিতার মধ্যেই যে ঐ সব আঘাত ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ রাখলেন তাই নয়, এঁদের ব্যক্তিগত জীবনাচারণেও বহুবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ ঘটল। মদ্যপান ও হল্লা করার অভিযোগে তাই 'কৃত্তিবাসে'র শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বহুবার গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। 'কৃত্তিবাস' আন্দোলনের আর একটা ব্যাপার হল কবিতাকে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের জনপদে ছড়িয়ে দেওয়া। গ্রাম গ্রামান্তরের কবি যশোপ্রার্থীদের কবিতা তাঁদের পত্রিকায় ছাপানো এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে তাঁদের ভ্রমন, মদ্যপান, কবিতা পাঠের আসর 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীকে ব্যাপক পরিচিত দান করল। পরিশ্রমী মনন চর্চার যে ঐতিহ্য ত্রিশের কবিদের ছিল কৃত্তিবাসী আন্দোলন তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রত্যক্ষ শারীরিক অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া, আত্মজৈবনিকতা এগুলিকেই মুখ্য করে তুললো। এঁরা বললেন, কবিতা বানানো সিগারেট ধরাবার মতো সোজা। যাই হোক, কৃত্তিবাস আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নৈরাজ্যমুখী আন্দোলন, 'কল্লোল' এবং 'কবিতা'-আন্দোলনের অনেক গুণ আয়ত্ত করলেও 'কৃত্তিবাস'-ই প্রথম বাংলা সাহিত্য-চর্চা কে গুরুগম্ভীর বিষয় থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের দিকে নিয়ে যায় এবং কবিতা ও সাহিত্যের বাণিজ্যকরণের কথা ভাবে। সাহিত্য শিল্পের প্রতি আত্মোৎসর্গের যে উদাহরণ, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের ব্যক্তিজীবনে পাই; কৃত্তিবাস-এর সম্পাদকদের মধ্যে তার অভাব লক্ষ করা যায়। 'কৃত্তিবাস'-ই সেই পত্রিকা ও আন্দোলন যার নায়করা সবাই শেষ পর্যন্ত দল বেঁধে একই সংবাদপত্রের অফিসে চাকুরি গ্রহণ করেন। তবু কৃত্তিবাস আন্দোলনের সার্থকতা এই যে, এখানকার বেশ কয়েকজন কবি লেখক পরবর্তীকালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। যেমন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, তারাপদ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় উৎপল কুমার বসু, বিনয় মজুমদার প্রমুখ। তাছাড়া, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'কৃত্তিবাস' জড়িয়ে পড়ে। যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের আন্দোলনের ইতিবৃত্তে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের আগে শেষ উল্লেখযোগ্য আন্দোলন বলতে 'কৃত্তিবাস' আন্দোলনকেই ধরতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. শিবনারায়ণ রায়, জিজ্ঞাসা, কার্ত্তিক পৌষ ১৩৯১, কলকাতা।

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ষষ্ঠখন্ড, ১ম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫৪।

৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ২৪।

৪. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কথা সাহিত্য, দেজ পাবলিশার্স, ১৯৮৬ কলকাতা, পৃঃ ১১০।

৫. সবুজ পত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২১, বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০০ পৃ ঃ ১।

৬. তদেব পৃঃ ১।

৭. তদেব পৃঃ ৩।

৮. বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, সেরা সবুজ পত্র, মিত্র ও ঘোষ, ২০০০, পৃঃ ৪-৫।

৯ বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০০ পৃঃ ৩।

১০. বিজিতকুমার দত্ত, সম্পাদকীয় ভূমিকা, সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ২০০০, পৃঃ সাত।

১১. Haithcox, John Patrik, Communism and Nationalism in India, Oxford University Press, Calcutta, 1971, Page 20.

১২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬।

১৩. বুদ্ধদেব বসু, (কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ) - কবিতা সংকলন, প্যাপিরাস, কলিকাতা ১৯৮৭ পৃ ঃ ১৩৬।

১৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের কথা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ ২৯, দ্রষ্টব্যঃ "মনে আছে, - মাদার-পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কী করে? ..... ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?

১৫. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কথা সাহিত্য, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৬।

১৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, ডি. এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ৮২।

১৭. হিরণকুমার সান্যাল, পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ২১।

১৮. বুদ্ধদেব বসু, 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধ, 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৬০ পৃঃ ১১০।

১৯. তদেব পৃঃ ১১১।

২০. সুবীর রায়চৌধুরী; 'বুদ্ধদেব বসু, প্রগতি থেকে প্রগতি লেখক সংঘ প্রবন্ধ, কলকাতা ২০০০ পত্রিকা ৮-৯ সংখ্যা, ১৩৯১, পৃ - ৫৬ পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮, পৃঃ ২৬২।

২১. প্রভাত কুমার দাস, 'সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু প্রগতি থেকে কবিতা' প্রবন্ধ তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে' গ্রন্থভুক্ত; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৬২।

২২. সুবীর রায় চৌধুরী, কবিতার সাময়িকী ও আধুনিকতা প্রবন্ধ, 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ ভুক্ত, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ২৯৯।

২৩. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কাব্য পাঠক / আধুনিক কবিতার ইতিহাস (নব সং), ভারতবুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ ঃ ২৭৯।

২৪. সুবীর রায় চৌধুরী, (বাংলা কবিতা পত্রের ইতিহাস), আধুনিক কবিতার ইতিহাস, নব সং, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৩ পৃ ঃ ৪০৯।

২৫. আলোক সরকার, 'শতভিষা' প্রবন্ধ, 'জিগীষা' পত্রিকা, রাণা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৮, প ৃঃ ২১।

২৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, (কৃত্তিবাস, প্রথম সংকলন, শ্রাবণ ১৩৬০), কৃত্তিবাস সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ ঃ ১।

২৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠকবিতা (শুধু কবিতার জন্য), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০ পৃ ঃ ১৮।

২৮. তদেব, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দেজ পাবলিশিং কলকাতা, পৃ ঃ ৩৪।

তৃতীয় অধ্যায়

হাংরি জেনারেশন অভিধাটির উৎপত্তি, আন্দোলনের প্রস্তুতি ও তত্ত্বনির্মাণ পর্ব

বাংলা সাহিত্যে 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলনই প্রথম ইংরেজী শব্দগুচ্ছ দিয়ে চিহ্নায়িত হয়। এর নেপথ্য ইতিহাস জানিয়েছেন এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা মলয় রায়চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন যে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হয়ে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার মধ্যে তিনি একটি সাহিত্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন - যা তাঁরই প্রভাবে 'হাংরি জেনারেশন' নামে চিহ্নিত হয়। যথা —

> ১৯৬১ সন। ... আমার বয়স বাইশ। কবিতা এবং মার্কসবাদে আক্রান্ত। একদিন আচমকা চুরমার হয়ে গেলুম কবি জিওফ্রে চসারের এই বাক্যবন্ধে - "In the sowre hungry time". মগজে চেপে গেল হাংরি কথাটা।[১]

সুতরাং 'হাংরি' অভিধাটি মলয় চসার থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে, ১৩৯১ সালে 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার কার্তিক পৌষ সংখ্যায় অতিধাটির একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি, এই সময়ে,

> মার্কসবাদের উত্তরাধিকার গ্রন্থটির জন্যে নোটস সংগ্রহ করা কালে, আমি অসওয়াল্ড স্পেংলার বর্ণিত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের হদিশ পাই। ওই বয়সে স্পেংলারে যে আকর্ষণ আমি খুঁজে পাই, তা হলো এই উপপাদ্য যে, একটি সংস্কৃতি তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যায় ঃ আরোহণ, রেণেশাঁস ও অবক্ষয়। প্রথম ধাপে তা সৃজনশীল এবং বাইরে থেকে কোনো প্রভাব গ্রহণ করে না। রেণেশাঁসে অকল্পনীয় উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং অবক্ষয়ে তা বহিরাগত সংস্কৃতির মুখাপেক্ষী। সেই সময়ে ১৯৬১ সনে অবক্ষয়ের এই কনসেপ্ট বঙ্গসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত লাগসই মনে হয়।[২]

যাইহোক, মলয় কথিত ১৯৬১ সালে যে প্রথম হাংরি মেনিফেষ্টোটি বার হয় সেখানে 'হাংরি জেনারেশন' শব্দবন্ধ প্রযুক্ত হয়। প্রথম ইস্তাহার দুটির দু'রকম রূপ পাওয়া যায় ঃ বাংলা ও ইংরেজী। কিন্তু কোনোটিতেই সাল ছাপানো নেই। উপরন্তু মলয়ের 'ইস্তাহার সংকলন' এর

প্রকাশক - কবি ও প্রাবন্ধিক ডক্টর উত্তম দাশ জানিয়েছেন যে, প্রথম ইস্তাহারটি ১৯৬২-এর এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়।[৩] অথচ মলয় তাঁর 'হাংরি কিংবদন্তী' (১৯৯৪) গ্রন্থে, 'হাংরি সাক্ষাৎকার মালা'য় (১৯৯১); 'কৃত্তিবাস থেকে হাংরি আন্দোলন ঃ বাংলা কবিতার পালাবাদল' (১৪১০) - প্রবন্ধে[৪], হাওয়া ৪৯' সংকলনে (১৪১২) প্রথম ইংরেজী বুলেটিনটির প্রকাশ কাল ১৯৬১ সাল বলেছেন। তবে 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার ১৩৯১ - কার্তিক পৌষ সংখ্যায় 'হাংরি আন্দোলন ঃ পিছন ফিরে দেখা প্রবন্ধে, মলয় স্বীকার করেন -

> প্রথম বুলেটিন থেকেই তারিখ দেবার চল গড়ে ওঠেনি এবং শেষ অব্দি এভাবেই চলে। যতদূর মনে পড়ে, শক্তি পাটনায় এসেছিলেন ১৯৬১ কালী পুজোর পর। তাই প্রথম হাংরি বুলেটিনের প্রকাশ কাল নভেম্বর ডিসেম্বর ১৯৬১ ধরে নেওয়া যায়।[৫]

অতএব প্রথম বুলেটিনের প্রকাশ কাল নিয়ে এখন নিঃসংশয়িত হবার উপায় নেই। হয়তো এ কারণেই 'হাংরি জেনারেশন' অভিধাটি মলয়ের দেওয়া বলে শৈলেশ্বর ঘোষ মানতে চাননি। তাঁর মতে, 'হাংরি অভিধাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া।[৬] তিনি বলেছেন, 'হাংরি জেনারেশনের প্রথম লিফলেটে বলা হয়েছিল, Led rebelliously by Sakti Chattopadhya'।[৭] সমস্যা এখানেও। কারণ, এ লিফলেটের ফটোকপিও শৈলেশ্বর কোথাও দিতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, শৈলেশ্বর বলেছেন যে, সতীন্দ্র ভৌমিকের 'এষণা' পত্রিকায় (১৯৬২) বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো চাকা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত' বলেছিলেন। শৈলেশ্বরের মতে, "এই লেখা থেকেই 'হাংরি জেনারেশন' নামের সূত্রপাত হয়।'[৮] যুক্তিসঙ্গত বিচারে দেখা যায় যে, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনটির সূচনা বর্ষ হিসেবে ১৯৬২ সনেরই প্রামাণিকতা বেশী। আবার, ইংরেজী লিফলেট গুলোর নিরিখে 'হাংরি জেনারেশন' এই অভিধার স্রষ্টা হিসেবে মলয়ের দাবী-ই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। হাংরি জেনারেশন এই পদগুচ্ছই ইংরেজী।

মলয় রায় চৌধুরীর প্রথম বাংলা বুলেটিনে 'ক্ষুধা' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে কবিতা একঘেঁয়ে ও আকর্ষণহীন হতে বাধ্য।[৯] এই বক্তব্যের সঙ্গে শক্তির বক্তব্যের খুবই সাদৃশ্য - "আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে ক্ষুধাসংক্রান্ত আন্দোলন হওয়াই সম্ভব ... আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত।

যে কোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কোনা রূপ কোন রস-ই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।"[১০] যে কোনো রূপ বা রসের ক্ষুধার সঙ্গে অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা'র কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং তত্ত্বে একটি মৌলগত সাদৃশ্য আলাদাভাবেই দু'জনের চিত্তে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তবে শক্তি 'ক্ষুধার্ত' তত্ত্ব নিয়ে আর এগোন নি। তা যে শুধু মামলা জনিত বা আদর্শগত কারণে তা নয়। শক্তি তাত্ত্বিক ধরণের কবি নন। তাঁর কবি মানসই হচ্ছে সহজিয়া পন্থী এবং লিরিকমুখী যা হাংরি কবিতার ধাঁতের সঙ্গে মিলতে পারে না। এছাড়া কবিতা নিয়ে কখনই তাত্ত্বিকতার দিকে শক্তি পরবর্তীকালে আর উৎসাহ দেখাননি। মলয় প্রথম ইস্তাহারেই কবিতার একটি উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞায়ন ঘটিয়েছিলেন,

> কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিরলস যুক্তি গ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে আবির্ভূত যে, জীবনের কোন অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরু বিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্ম্য সিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী বিরোধিতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক। এ ক্ষুধার একমাত্র লালনকর্তা কবিতা কারণ কবিতা ব্যতীত কী আছে আর জীবনে! মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়[১১]

১৩৯১ সালে 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার কার্ত্তিক পৌষ সংখ্যায় 'হাংরি' অভিধার স্বীয় তত্ত্বটিকে গুছিয়ে বলেন মলয় -

> "এই সময়ে, মার্কসবাদের উত্তরাধিকার গ্রন্থটির জন্যে নোটস সংগ্রহ করা কালে, আমি অসওয়াল্ড স্পেংলার বর্ণিত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের হদিশ পাই। ওই বয়েসে, স্পেংলারএ যে আকর্ষণ আমি খুঁজে পাই, তা হলো এই উপাপাদ্য যে, একটি সংস্কৃতি তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যায় ঃ আরোহণ, রেনেশাঁস ও অবক্ষয়। প্রথম ধাপে তা সৃজনশীল এবং বাইরে থেকে কোনো প্রভাব গ্রহণ করে না, রেনেশাঁসে অকল্পনীয়

উদ্ভাবনক্ষমতা এবং অবক্ষয়ে তা বহিরাগত সংস্কৃতির মুখাপেক্ষী। সেই সময়ে, ১৯৬১ সনে, অবক্ষয়ের এই কনসেপ্ট বঙ্গসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত লাগসই মনে হয়। সংস্কৃতিক অবক্ষয় ওরফে সর্বগ্রাস এই দার্শনিক সর্বগ্রাসে আরোপ হল চসার কথিত হাংরি। অবক্ষয়ের নির্বিচার দ্বিধাহীন আত্মসাৎ প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য হাংরি কথাটা। হাংরি শব্দের কোনো যুৎসই বাংলা আমি তখন খুঁজে পাইনি। ক্ষুধিত, ক্ষুৎকাতর, ক্ষুধার্ত'র মধ্যে হাংরির সামগ্রিক নির্ণয় পাইনি। পরে ১৯৬৪ নাগাদ, আলোচকদের বিদেশী এই চেঁচামেচিকে ঠেকনো দেবার জন্যে কখনও ক্ষুধিত বা ক্ষুৎকাতর ব্যবহার করেছিলুম।"[১২]

লক্ষণীয়, এখানে হাংরি কথাটির দুটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট ঃ (ক) অর্থনৈতিক ক্লিন্নতা। (না হলে মার্কর্সবাদের অনুষঙ্গটি থাকত না।) (খ) সার্বিক অবক্ষয়। স্পেংলারের 'ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট' তাই মলয়কে প্রভাবিত করে। একদিক থেকে মনে হয়, প্রাগুক্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৬২ সনে লেখা 'ফিরে এসো চাকা'র সমালোচনাটি থেকেই 'সর্বগ্রাস' পদটি মলয় গ্রহণ করেছিলেন। শৈলেশ্বরও তাই মনে করেন। বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা' গ্রন্থের আলোচনায় শৈলেশ্বর লেখেন, "ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ক্ষুধা এইভাবে তৃপ্তি খুঁজছে। সর্বগ্রাসী এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের আত্মার প্রতিটি কোষে আজ বিরাজ করছে। বাসুদেবের 'রন্ধনশালা' গল্পে সেই সর্ব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা এই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে।"[১৩] উপরন্তু লেখেন, "বস্তু সমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ই হাংরি জেনারেশন আন্দোলন।"[১৪] প্রদীপ চৌধুরীর মতে, "Keats, বলেছিলেন, No Hungry generation Can tread thee, immortal Bird! একজন লেখক এই অর্থেই হাংরি হতে পারেন। ব্যবহারিক জীবনের বা বুর্জোয়া জীবনের ক্ষুধা নয়, প্রতিটি লেখকই এই ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির, এই ক্ষুধা থেকেই যাবতীয় শিল্পের সৃষ্টি। Keats' এর এই immortal bird (শিল্প, শিল্পাদর্শ)-এর পিছনে ছুটতে ছুটতেই একজন লেখকের জীবন শেষ হয়ে যায়।"[১৫] প্রদীপ সম্ভবতঃ সৌন্দর্য ও শিল্পাদর্শের ক্ষুধার কথা বলেছেন। তবে তার সঙ্গে হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যাদর্শকে মেলানো যায় না। বরং এর বিপরীত ব্যাপারটিই এখানে সত্য। তাই, মলয় এবং শৈলেশ্বরের বয়ান থেকে 'হাংরি জেনারেশন' পদগুচ্ছের যে, স্বাভাবিক বিশিষ্টতাগুলো স্পষ্টতা পায় তা অনেকটা এরকম ঃ

১) হাংরি হচ্ছে সার্বিক অবক্ষয়ের নির্বিচার বিস্তার প্রক্রিয়া। মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির এক অবক্ষয়ী সর্বগ্রাসিতা।

২) সামাজিক অসচ্ছলতার পটভূমিকায় সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। তা যে কোনো রূপের বা রসেরও ক্ষুধা।

৩) ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের সর্ব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা। ভারত-আত্মার প্রতিটি কোষে তা বিরাজমান।

'হাংরি' অভিধাটির উৎপত্তি নিয়ে যেমন, মলয়, শৈলেশ্বর ও শক্তি প্রমুখদের মতানৈক্য তেমনই কে এই আন্দোলনটি শুরু করেছিলেন তা নিয়েও এঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। মলয় তাঁর নানা প্রবন্ধে, বিশেষ করে 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থে একরকম ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। শৈলেশ্বর ঘোষ তারই প্রতিবাদে 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন' নামে আর একখানি গ্রন্থ লিখেছেন। উত্তম দাশের 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' নামে গ্রন্থ বার হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন লেখক নানা পত্র পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ লিখেছেন। বার হয়েছে সমীর চৌধুরীর 'হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন'। কিন্তু এ সব গ্রন্থের প্রতিটিতেই একটি করে নির্দিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও মলয়ের দেওয়া তথ্য ও বিবৃতিকে নির্বিচারে মান্য করে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা, কোথাও বা শৈলেশ্বরের বিবৃতি ও বিচারকে। সুতরাং বিষয়টিকে আমাদের পুনর্বিচার করতেই হবে। প্রথমে মলয়ের বক্তব্য —

> "হাংরি আন্দোলনের পরিকল্পনা আমিই করেছিলুম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে হাতে অফুরন্ত সময়। ..... ১৯৬১সন। ..... আমার চারপাশের বাস্তবের সঙ্গে দেখি বাংলা কবিতার কোনও সম্পর্ক নেই। পড়ে ফেলেছি ততদিনে পশ্চিমের ইমেজিষ্ট সিমবলিষ্ট স্যুররিয়ালিষ্ট ডাডাইষ্ট ফিউচারিষ্ট আন্দোলনের খবরাখবর। বাংলাভাষায় খোলস ঝেড়ে ফেলার জন্যে আন্দোলন দরকার। কিন্তু পাটনায় থেকে তা তো সম্ভব নয়। লালমোহন দাস সম্পাদিত 'ছোটগল্প' লিটল ম্যাগাজিনে একটা আনকোরা নাম আর ঠিকানা খুঁজে পেলুম ঃ হারাধন ধাড়া। আন্দোলনের জন্যে মনে হল এই নামটার ইমপ্যাক্ট হবে একেবারে নতুন।"[১৬]

নতুন কেন? মলয় পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, বর্ণহিন্দুর একাধিপত্যে এ ধরনের একটি প্রান্তিক নাম ও মানুষ একটি নতুন প্রবণতার সূচনা করবে। যদিও দেখা গেল যে, হারাধন ধাড়া ইতিমধ্যেই এফিডেফিট করে নিজের নাম করেছেন দেবী রায়। কারণ, হারাধন ধাড়া নামটা ভালো না। মন্বন্তরের দেবী সিংহ আর সীতাংশু রায়-এর পটভূমিতে তিনি নিজেকে তৈরী করেছেন — দেবী রায়। যাহোক, নিজের আন্দোলনের কথা মলয় দেবীকে বললেন। ঠিক হলো পাটনায় লিফ্‌লটের আকারে তাঁদের মুখপত্র ছাপানো হবে, ম্যাগাজিনের মতো করে নয়। ঠিকানা দেওয়া হবে দেবীর। শুরু থেকেই "সবরকম এলিটিষ্ট ব্যপার জলাঞ্জলি দিয়ে" এগোনো হবে। ইতিমধ্যে দাদা সমীর রায়চৌধুরীর সহায়তাও নিলেন মলয়। পাটনার তপন প্রিন্টিং প্রেস হাংরি শিরোনাম দেখে বুলেটিন ছাপতে রাজী হল না নানা আশংকায়। এবার 'জব প্রেস' থেকে হাংরি আন্দোলনের প্রথম বুলেটিন ছাপানো হল। মলয় বলেছেন, 'হাংরি আন্দোলনের প্রথম আওয়াজ, কেন হাংরি শব্দের প্রয়োজন, আমরা কী করতে চাই, কেন হাংরি সময়।"[১৭] এই বুলেটিনের - বাঁ দিকে লেখা আছে

স্রষ্টা ঃ মলয় রায়চৌধুরী

লেখক ঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ দেবী রায়

উপরে শিরোনাম — হাংরি জেনারেশন। ডানদিকে শুরু হয়েছে — "কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্য কারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিরলস যুক্তি গ্রন্থন নয়। এখন এই সময়ে অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজনে এমনভাবে আর্বিভূত যে, জীবনের কোন অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন মেরু বিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্ম্য সিদ্ধি।"[১৮] ইত্যাদি। দিনকতক পরেই, সেটা নভেম্বর ১৯৬১' ধুতি-শার্ট পরা দাড়ি-ওয়ালা চশমা পরা এক রুক্ষ্ম চুলের যুবককে সঙ্গে করে সমীর রায় চৌধুরী মলয়ের কাছে উপস্থিত। এই যুবকটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এঁর সঙ্গে মলয় হাংরি আন্দোলন নিয়ে কথাবার্তা বললেন। উৎসাহিত শক্তির সঙ্গে কিছু স্ট্রাটেজিও ঠিক হল। মলয় দেবীকে লিখলেন শক্তির কথা। টাকাও পাঠালেন লেখাপত্র ছাপাবার জন্যে। এবার ইংরেজিতে বুলেটিন ছাপলেন মলয়। তাতে লেখা হল, Creator - Maloy Roy Chowdhury, Leader - Sakti Chattopadhyay, Editor, Devi Roy. Published by Haradhon Dhara from 269 Netaji Subhas

Road, Howrah, West Bengal, India.[১৯] শক্তি তখন পাটনায় মলয়ের কাছে। কলকাতায় ফিরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'সম্প্রতি' পত্রিকায় ১৯৬২ সালে লিখলেন, 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব।' হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাবনা সেটি। যদিও বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো ঢাকা' বইয়ের আলোচনা-ই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একটি গ্রন্থ-আলোচনা হাংরি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে ফেললো। শক্তি লিখলেন,

> "বিদেশে সাহিত্যকেন্দ্রে যে সব আন্দোলন বর্তমানে হচ্ছে, কোনটি বীট জেনারেশন, কোনটি এ্যাংরি বা সোবিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলা দেশেও কোন অনুক্ত বা অপরিষ্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে ক্ষুধা সংক্রান্ত আন্দোলন হওয়াই সম্ভব। ওদিকে ওদেশে সামাজিক পরিবেশ এ্যাফ্লুয়েন্ট, ওরা বীট বা এ্যাংরি হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যে কোন রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কারণ এ আন্দোলনের মূল কথা 'সর্বগ্রাস।' অর্থাৎ ভাত ডাল চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে এই আন্দোলন বীট জেনারেশন সমেত মেখে লঙ্কা ও নিমকের টাকনা দিয়ে গ্রাস করতে চায়। বদহজম সংক্রান্ত কথা উত্থাপিত হবে না আশা করি। কারণ বদহজমই হল শিল্প। জীবন চিবিয়ে যতটুকু অখাদ্য তার বমনই হল গদ্য পদ্য ছবি ইত্যাদি। গু গোবরের সামিল।"[২০]

পাটনায় বসে মলয় রায়চৌধুরী দেবী রায়ের পোষ্টকার্ড মারফৎ কলকাতায় ঐ সব লিফলেট, গ্রন্থ আলোচনা নিয়ে উত্তেজনার খবরগুলি পেতে লাগলেন। মলয় অবশ্য এটাকে আন্দোলন বলেছেন, যদিও সৃষ্টিশীল রচনার এখনও কোনো দেখা নেই। সেই সম্ভাবনা এবার দেখা দিতে শুরু করল। ঐ পোষ্টকার্ডেরই খবর - "সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, উৎপল কুমার বসু যোগ দিয়েছেন। বাসুদেব দাশগুপ্ত ফোন করেছেন। শান্তিনিকেতন থেকে প্রদীপ চৌধুরী কবিতা ছাপাতে চান।"[২১] পাটনার আরেক তরুণ সুবিমল বসাক মলয়ের কাছে তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যকর্মে অংশভাক্ হতে চাইলে তিনি তাকে দেবী রায়ের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ করতে বললেন। তাছাড়া তখন সুবিমল চাকরিতে বদলি হয়েছেন কলকাতায়। এবার সুবিমলও কলকাতা থেকে

মলয় রায় চৌধুরীকে উত্তেজনার খবর পাঠাতে শুরু করলেন। কী সেই খবরগুলো? যথা, বুলেটিন দেওয়া মাত্রই কফি হাউসে অনেকে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেলেন। দেবীকে দলবদ্ধ প্রহারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সুবিমলকে শাসানো হচ্ছে নখে আলপিন ফোটানোর। কিন্তু কেন? তাঁদের কি সাহিত্যকর্ম ছাড়া অন্য কোনো দৌরাত্ম্য ছিল? তাঁরা বহিরাগত বলে? কেননা তাঁদের কোনো লেখা তখনও পাওয়া যায় নি। লিফলেটের মধ্যে প্রচারিত বক্তব্যগুলোই কি এই উত্তেজনার কারণ? মলয় জানিয়েছেন, ১৯৬১, সালে তিনি অন্য ধরণের, নিজস্ব ধরণের কবিতা খুঁজছেন। অর্থাৎ সাহিত্য আন্দোলন বলতে তো শুধু ইস্তাহার ও কর্মসূচী নিরূপণ নয়, নতুন ধরণের সাহিত্যকর্মও বটে। এবার সেইদিকে যাত্রা।

শৈলেশ্বর ঘোষ 'হাংরি' অভিধা ও হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতির কিছুটা ভিন্ন ইতিহাস জানিয়েছেন। তাঁর মতে 'হাংরি' অভিধাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া। কারণ হাংরি জেনারেশনের প্রথম লিফ্লেটে বলা হয়েছিল, 'Led rebelliously by Sakti Chattopadhay'.[২২] তাছাড়াও হাংরি আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে শক্তির সপক্ষে তিনি প্রাগুক্ত বিনয় মজুমদারের গ্রন্থসমালোচনাটির উল্লেখ করেছেন।[২৩] এ কথা ঠিক যে, হাংরি জেনারেশন প্রথম লিফলেট কোনটি এবং তা কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল তা নিয়ে ঐকমত্য সম্ভব নয়। মলয় যেমন বলেছেন, প্রথম বুলেটিন নভেম্বর ১৯৬১ সালে বার হয়েছে[২৪] ঠিক তেমনই উত্তম দাশ জানিয়েছেন, ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে হাওড়া থেকে তা বেরিয়েছিল।[২৫] ঐ সংখ্যা তিনি নিজে দেখেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তম দাশ মলয় রায় চৌধুরীর, 'ইস্তাহার সংকলনে'র প্রকাশক। এরকম হবার কারণ লিফলেট সংগ্রহ যোগ্য নয়, একাধিক লিফলেট ছেপে অন্যটিকে পরিবর্তন করা সহজ এবং লিফলেট ছাপানোও খুব সহজ। এ কারণেই 'উৎপল কুমার বসু ১৯৯৪ সালে একটি সাক্ষাৎকারে 'যোগসূত্র' পত্রিকায় বলেছিলেন - 'হয়তো ত্রিপুরা থেকে একটা কাগজ বেরুল, নাম দিয়ে দিল হাংরি জেনারেশন' বুলেটিন নম্বর ১২, হয়তো তার ১০ বা ১১ বেরোয়নি।[২৬] শৈলেশ্বর এই আন্দোলনের প্রস্তুতি ইতিহাসও অন্যভাবে লিখেছেন। তাঁর মতে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এর সূত্রপাত করেছিলেন খামখেয়ালের বশে। কোনো আদর্শগত বোধ ও সাহিত্য চর্চার লক্ষ নিজের দেওয়া সূত্রের মধ্যে তিনি করেননি। সংগঠিতও করেননি কাউকে। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুবান্ধব যেমন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, বিনয় মজুমদার, সৈয়দ সুস্তাফা সিরাজ হাংরি আন্দোলনের সূচনা অংশে কিছুটা জড়িয়ে গিয়েছিলেন। মলয় লিখেছেন, "প্রথম দিকের বেশির ভাগ বুলেটিনে শক্তির কবিতা প্রকাশিত হয়, কিছু কবিতা তিনি নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। সন্দীপন

আর বিনয়ের বেশি লেখা বেরোয়নি। উৎপলের বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।"[২৭] কিন্তু তাঁদের এই কবিতাগুলো ইতিপূর্বে প্রকাশিত অন্যান্য রচনার স্বগোত্র। কিংবা বাঁ হাতের রচনা। কোনো নতুন কণ্ঠস্বর, প্রতিবাদের তীব্রতা - যা হাংরিদের বৈশিষ্ট্য তা এখানে মেলে না। শক্তি তো ইতিমধ্যেই বিখ্যাত, 'দেশ' পত্রিকার নামী কবি। সুতরাং হাংরি ধ্যান ধারণাকে কাব্যরূপ দেবার দায় তাঁর ছিল না। তাছাড়া ওঁরা ছিলেন 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর। তাৎক্ষণিক খেয়ালে হাংরি বুলেটিনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় 'কৃত্তিবাসে' ভাঙন ধরেছিল। আসলে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু সমীর রায় চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রেই মলয়ের সঙ্গে ওঁদের যোগাযোগ ঘটে। শৈলেশ্বর লিখেছেন যে, শক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এদিক থেকে হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে মলয়ের সংগঠনী ক্ষমতাকে অস্বীকার করা যায় না। যাই হোক, হাংরি জেনারেশন 'কৃত্তিবাসে' ভাঙন ধরিয়েছিল। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ('কৃত্তিবাস' এর অন্যতম নেতা) তা স্বীকার করেছেন, "আসলে ভাঙন শুরু হয়েছিল দু' তিন বছর আগেই, যখন শক্তি, উৎপল আর সন্দীপন তথাকথিত হাংরি আন্দেলনের সঙ্গে যুক্ত হয়।"[২৮] এ জন্যই পরে 'কৃত্তিবাস' কে ঘোষণা করতে হয়েছিল যে, হাংরিদের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারও আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে হাংরি আন্দোলনের বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছিল। ২১.১১.৬২-এই তারিখের হাংরি জেনারেশন বুলেটিনে তাঁর S.C এই ছদ্মনামে একটি ইংরেজি কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল। কবিতাটির প্রথম লাইগুলি এরূপ ঃ

'Stop Hungry movement boys ...
Stop writing libidieous apocalptic
Stop symbolism, stop stop surrealism
stop stop stop stop, what, BOMB.'

কবিতাটির একদম শেষে লেখা ছিল - 'your faithful - anti Hungry poet'. 'এষণা' - পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৭০ সংকলনে সন্দীপন লিখেছিলেন, 'হাংরি জেনারেশন আমার cause নয়, আমি মনে করি সিক জেনারেশন, যদিও ৫ নং বুলেটিনে আমার একটি ছোট গদ্য বেরিয়েছিল।'[২৯] 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ২০ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল,"... আমরা লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হলুম যে হাংরি জেনারেশন নামে কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সঙ্গে কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। ... হাংরি নামে অভিহিত কোনো কোনো কবি কৃত্তিবাসে লেখেন, বা ভবিষ্যতে

অনেকে লিখবেন, কিন্তু অন্যান্য কবিদের মতোই ব্যক্তিগত ভাবে, কোনো দলের মুখপত্র হিসেবে নয়।"[৬] আবার 'কৃত্তিবাস' - সংকলন. ২'এর মুখবন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন "... কৃত্তিবাস লেখক গোষ্ঠীরই একটি অংশ হাংরি জেনারেশন নামে একটি আন্দোলন শুরু করে। প্রায় একই লেখক গোষ্ঠী হলেও কৃত্তিবাস পত্রিকা ঘোষিত ভাবে হাংরিদের সঙ্গে সম্পর্ক বিযুক্ত থাকে।"[৭] এই সব রচনা ও বয়ানের মধ্যে এত স্ববিরোধিতা যে, সত্যই বুঝতে অসুবিধা হয় হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে কে বা কারা নিয়ামক শক্তি? মলয় রায় চৌধুরী, দেবী রায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘোষিত ত্রয়ী? নাকি মলয় একাই? নাকি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের তৎকালীন পরিচিতি? নাকি শক্তি, উৎপল কুমার বসু ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের নাম মহিমা? লক্ষণীয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো এখানে অমিতাভ চৌধুরীও বলেছেন, "কৃত্তিবাস'-এর কয়েকজন লেখকের নেতৃত্বে যে 'হাংরি সাহিত্য'। সেটি শুধুমাত্রই ব্যর্থ অনুকরণ প্রচেষ্টায় দুর্বল বলেই আমার মনে হয় ..." ইত্যাদি।[৮] ১৯৭৪ সালে আদিল জুস্সাওয়ালা সম্পাদিত পেঙ্গুইনের 'New writings in India' গ্রন্থেও সন্দীপন সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "He was also responsible for starting the Hungryalist movement in Bengali along with Shakti Chattopadhya, the poet and Utpal basu, now in London."

সানফ্রানসিসকো থেকে প্রকাশিত City lights Journal পত্রিকার ৩নং সংখ্যায় 'Hungry Generation' নিবন্ধে Debi Roy and others' লিখেছেন যে, এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মলয় রায় চৌধুরী, দেবী রায়, বাসুদেব দাশগুপ্ত ও উৎপল কুমার বসু। মলয় নিজে সর্বত্র চারজনের নাম করেছেন - শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরী, দেবী রায় ও মলয় রায় চৌধুরী।[৯] এ সব থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সাংগঠনিক অব্যবস্থার ছবিটি আমরা পাই। উৎপল কুমার বসু বলেওছেন,

> হাংরি জেনারেশন সে ভাবে কোনো সংগঠিত আন্দোলন ছিল না। যার খুশি, যেখান থেকে পারে হাংরি জেনারেশন নাম দিয়ে বুলেটিন বের কর বাজারে ছেড়ে দিত। এই আন্দোলন ছিল অনিয়ন্ত্রিত। কতকগুলো ফতোয়া মলয়, সমীর শক্তি লিখেছিল। ... হয়তো ত্রিপুরা থেকে একটা কাগজ বেরুলো, নাম দিয়ে দিল হাংরি জেনারেশন বুলেটিন নম্বর ১২। হয়তো তার ১০ বা ১১ বেরোয়নি।[১০]

এ সব কারণে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ১৯৬১-৬৩ পর্বটিকে বলা যায় সলতে পাকানোর কাল। হাংরি জেনারেশন এই সলতে পাকানোর কালে কিছু তাত্ত্বিক সূত্র মলয় রায় চৌধুরী ১৯৬১ সাল থেকে রচনা শুরু করেন। কেন একটি সাহিত্য আন্দোলন দরকার, সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্যই বা কী, করণীয় কী এ সব নিয়ে ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অনেকগুলি ইস্তেহার বা প্রচারপত্র বিলি করেন তিনি। এগুলিরই কিছু অংশ পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে 'ইস্তাহার সংকলন' নামে 'মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা' থেকে বার হয়। আবার এগুলিরই সূত্রসমবায়ে মধ্যবর্তী সময়ে, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে পাটনা থেকে আর একটি পুস্তিকা বার হয়েছিল। তার নাম "মৃত্যু মেধী শাস্ত্র ঃ প্রথম ইনষ্টলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন।" প্রকাশক ছিলেন মলয় স্বয়ং।

ঐ পুস্তিকায় মলয় তাঁদের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষকে সুনির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তবে আন্দোলনের বিষয়-ভূমি হিসেবে কবিতাই কেবল ধর্তব্য ছিল। কবিতার অমোঘতা বা অনিবার্যতার কথা সেখানে তিনি সজোরে বলেছিলেন। এত কাল ধরে বাংলাভাষায় কোন কোন ধরণের কী কী কবিতা লেখা হয়েছে, যুগ ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেগুলির কতটুকু সার্থকতা বা ব্যর্থতা তা নিজস্ব যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে মলয় বিশ্লেষণ করেছেন। পুস্তিকাটির প্রথম পংক্তিটি শুরু হয়েছে ইতিহাস ও তত্ত্বের একটি আপাত মোড়কে। যে তত্ত্বটি প্রথম পংক্তিতে মলয় উপস্থাপিত করেছেন তা সম্পূর্ণ রূপে আত্মস্থ করতে পাঠককে পৌছতে হবে গ্রন্থের অতিসংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছদে। প্রথম পংক্তিটিতে মলয়ের বক্তব্য এরূপ ঃ "র‍্যাশনালিজম ও রোম্যান্টিসিজমের যুদ্ধ বাংলার শিল্প সাহিত্যকে রেখে গেছে এক শূন্য প্রান্তরে, রক্তের দাগটা আরম্ভ হয়েছে সেখানে থেকে, সেখান থেকে প্যারেনথেসস।"[৩৫] এরপর র‍্যাশনালিষ্ট ও রোম্যান্টিকরা কী কী করেছেন তা আধাবিমূর্ত্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন প্রবন্ধকার। বলেছেন যে র‍্যাশনালিষ্টরা অগ্রবর্তী, রোম্যান্টিকরা উত্তরকালীন। প্রথমোক্তরা কবিতায় মস্তিষ্ক এবং দ্বিতীয়েরা কবিতায় হৃদয়ের ব্যবহার করেছিলেন। এই দুটো প্রবণতাকেই মলয় বলেছেন "কাটা হাতের যাত্রা সঙের টানা হ্যাঁচড়া।"[৩৬] তাই 'ইতিহাসের মাঠ পড়ে রইল শেষে তার শূন্য জঠর নিয়ে। দু একটা মস্তিষ্কবাহী অথবা হৃদয়ধারী লাশকে দেখা গিয়েছিল এক আধবার নড়ে উঠতে।"[৩৭] এসব দ্বারা মলয় বলতে চান যে, বাংলা ভাষায় এ কালে যথার্থ সৃজনশীল কবিতার আবির্ভাব ঘটেনি; 'শূন্যপ্রান্তর', 'শূন্য জঠর' প্রভৃতি শব্দাবলী প্রবন্ধকারের এই মানসিকতার দ্যোতক। র‍্যাশনালিষ্ট ও রোম্যান্টিকদের যুদ্ধের কাল পর্ব হিসেবে

তিনি যে উত্তর রবীন্দ্রপর্বের আধুনিক কালকেই বুঝিয়েছেন এটা গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্পষ্টীকৃত হয়েছে।

মলয় বাংলা কবিতার মূল্যায়নে মধুসূদনকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন, "র‍্যাশনালিষ্ট ও রোম্যান্টিকদের যুদ্ধের আগে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে একজন বাঙালী কবির আবির্ভাব হয়েছিল, আজ পর্যন্ত যাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নি, সেই কবি, বহুকাল আগেই, ফেলে দিতে চেয়েছিলেন মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে।"[৩৮] মলয় বলতে চান যে, মধুসূদন র‍্যাশনালিষ্ট বা রোম্যান্টিক কোনো প্রকোষ্ঠের মধ্যেই পড়েন না। মস্তিষ্ক বা হৃদয়েরও চেয়ে মধুসূদনের প্রবল ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা তাঁর কাব্যাবলীতে প্রতিফলিত। তাঁর প্রাণশক্তি তাঁর কবিতারও প্রাণশক্তি। বাংলা ভাষা থেকে কবিতার এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গিয়েছিল। বাঙালী কবিরা মধুসূদনের এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন নি। অতঃপর মলয় লিখেছেন - 'মধুসূদনের পর আরেকজন কবির আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর নাম জীবনানন্দ"[৩৯] এই স্তর বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত। বিদ্রোহ পরম্পরায় রবীন্দ্রনাথ নেই। তবে তাঁকে একটি যুগ হিসেবে দেখা হয়েছে। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের কাঁধের উপর দিয়ে দিগন্তে একবার তাকানো উচিত ছিল এঁদের, দু'চোখ খুলে।"[৪০] এঁদের বলতে জীবনানন্দ ব্যতীত অন্যান্য রবীন্দ্রোত্তর কবিদের বোঝানো হয়েছে। মলয় এসব কবিদের মধ্যে মস্তিষ্ক ও হৃদয় এবং বুদ্ধি ও আবেগের দোলাচলতা লক্ষ করেন। বাংলা কবিতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা, বিশ্লেষণের এটাই পদ্ধতি মলয়ের। তাঁর মতে প্রথাগত, ইতিহাস বিচার অর্থহীন, কারণ তা ধারা বিবরণী মাত্র। তিনি সাহিত্যের অর্জনকেই (achievement) বলেন, 'ইতিহাসের সীমানাচিহ্ন।' বলেন, "অনেকেই তো ধারাবিবরণী আর ইতিহাসের পার্থক্য জানেনা।"[৪১] মলয় কথা বলেন এ কালের জমিতে দাঁড়িয়ে। তাঁর মতে, কবিতা এখন বিশাল নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে। অ্যারিষ্টটলের বাস্তবতা এখন অচল। লখিন্দরের ট্রাজিক লোকায়ত উপাখ্যান বা রবীন্দ্রনাথের দুঃখের শান্তিমূল্য আর লেখা হতে পারে না। তিনি জানান - 'শিল্প এখন পবিত্র সন্ত্রাসে স্নিগ্ধ।' শুধু বিষয় বা মেজাজের দিক থেকে নয়, কবিতার আঙ্গিকেও আর চলতি নিয়মে থাকবে না। তাঁর ভাষায় —

> কবিতা মার্বেল নয় - কবিতা রসটসের ব্যাপার নয়। কবিতা কবিতা। শিল্পীর কাছে যা বিষয়বস্তু সেটাকেই ফর্ম বলে মনে করে থাকেন তাঁরা যাঁরা নিজের রক্তে হাত ডুবিয়ে শিল্পকে পান নি। সে জন্যই এখন শব্দ ও অর্থের ধাক্কাধাক্কি ফাটাফাটি ও টানাপোড়েনে একটি কথার

আবির্ভাব হয়, নিখুঁত কথা, পথ চলতি অর্থের ঢাকনি খুলে অপূর্ব কৌটোর মধ্যে থেকে বের করে আনা গূঢ় হায়ারোগ্লীফ।[৪৩]

বোঝাই যায়, আদিমতার দিকে কবিতার ভাষা ও বিষয়কে নিয়ে যেতে চাইছেন মলয়। পুরনো আন্দোলনগুলি থেকে মুক্তি চাইছেন কবিতার। তাই বলেন, বাস্তববাদ, চেতনাপ্রবাহ, পরাবাস্তববাদ আর এদের কোনো ক্ষমতা নেই কবিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার, এরা বড্ড বেশী বুড়ো হয়ে গেছে।[৪৪] আর কবিতা হচ্ছে সত্যের প্রতিরূপ। তবে তা রবীন্দ্রনাথের 'সত্য' নয়। অনিয়ন্ত্রিত এই সত্য আকাঁড়া বাস্তব। মলয় বলেন, "সত্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কখনও যায়নি। কবিতা তাই এখন এতো স্ট্রেটফরোর্য়াড।"[৪৫] সৌন্দর্য চর্চাও কবিতায় এখন বাহুল্য ছাড়া কিছুই নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চাশ ও ষাট দশকের অন্য কবিদের আঘাত করেছেন। বলেছেন, "প্রেম, দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ সংযম এগুলি, ওই যুদ্ধের পর, কেমন যেন ন্যাকামি আর ছেনালীতে বদলে দিয়ে গেল ঐ সময়কার কবিতা।"[৪৬] এরপর মলয় এসেছেন কবিতার মানবিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গে। মূল্যবোধের চেয়েও আমাদের দৈনন্দিন ভয়াবহ অস্তিত্ব-যন্ত্রনাই কবিতার উপজীব্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন -

> "দিনের পর দিন, আমাদের চোখের সামনেই টানটান হয়ে বেড়ে যাচ্ছে কলকাতা। অথচ অস্তিত্ব যে ইহকালীন। যা হয়নি, বাস্তবে যা নেই তাকেই কি মূল্যবোধ বলা হয়ে থাকে? তবু মানুষ একা একা অপেক্ষা করে, একটা মেটাফিজিক্যাল ভ্যাকুয়ামের শরীর নিয়ে পড়ে থাকে, পড়ে থাকে চুপটি করে বিশাল পাইথনের মতন। মৃত্যু পর্যন্ত সে হাঁ করে থাকে, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত।"[৪৭]

গ্রন্থটিতে পরের দিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, হাংরি কবিতা এই তথাকথিত মানবজীবন পর্বের উপাখ্যান।

র‍্যাশনালিজম ও রোম্যান্টিসিজমের যে যুদ্ধের কথা মলয় গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন - যার প্রেক্ষিত এবং সময় উল্লেখ করেননি - তা শেষ পর্যন্ত ছোট্ট চারটি লাইনে সূত্রায়িত করেছেন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। ঐ চারটি লাইনেই একটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ : "বিহারীলালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে আমি র‍্যাশনালিজমে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। বিহারীলাল থেকে কল্লোল কালের পূর্ব পর্যন্ত র‍্যোম্যান্টিসিজম। তারপর কল্লোল কাল থেকে ওদের যুদ্ধ ঠিক আমাদের আগেকার সিনটুকু

পর্যন্ত। আমাদের কাল ১৯৬২ থেকে।" মলয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী থেকে ১৮৬২ র‍্যাশনালিজম পর্ব, ১৮৬২ থেকে ১৯২৩ রোম্যান্টিসজিম, পর্ব। ১৯২৩ থেকে ১৯৬১ র‍্যাশনালিজম ও রোম্যান্টিসিজমের যুদ্ধ।[৪৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৬২ সালেই 'সংগীত শতক' কাব্যগীতি নিয়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর আবির্ভাব। তাঁর গদ্য গ্রন্থটিকে কাব্য আলোচনায় ধরা হচ্ছে না যেটি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম আবির্ভাব। রোম্যান্টিসিজম ও ন্যাশনালিজমের যুদ্ধের পর্বে ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ এবং ষাটের কিছু নামী প্রতিষ্ঠিত কবিদের তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দকে পৃথক করা হয়েছে। রোম্যান্টিসিজম পর্বে একইভাবে রবীন্দ্রনাথকেও আলাদা করা হয়েছে। বাকী কবিদের মলয় তত গুরুত্ব দিতে চান নি। পুস্তিকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে কবিতা কী, বিশেষ করে হাংরিদের কবিতার বিষয়বস্তু কী মলয় তাই ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন,

> কবিতা মানুষের সম্পূর্ণ একলার জিনিস ... জীবনের সমস্ত পুঁজ রক্ত, লালা, কফ, শ্লেষ্মা এই সমস্ত নিয়েই কবিতা ... কবিতা মানুষর অনিয়ন্ত্রিত বোধের সংযমহীন আত্ম উপস্থাপন বলে, অকবিরা পয়ারের লুব্ধ নপুংসকতায় কর্তিত পৌরুষ নিয়ে হামাগুঁড়ি দিতে চায়। আমি কী? আমি কে? আমি কেন? আমি কেমন করে? আমি কোথায়? এই সকল প্রশ্নের চোট ও বিস্ফোরণ ছাড়া কবিতার আর কিছু করার নেই। অস্তিত্বের সমস্ত অসম্ভবকে চিরে তার অন্তরমহল দেখার নিদারুন অপ্রতিহত চেষ্টা থেকে কবিতা। আমিই আমার থিম।[৪৯]

অর্থাৎ ব্যক্তির সত্তা সন্ধান এবং সেই অর্থে আত্ম সত্তা নির্মাণই কবির কাজ। এ কথা স্বীকার্য, কিন্তু নতুন কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথ একেই একসময় বলেছিলেন 'আত্মপ্রকাশ'। 'আত্মপ্রকাশ' নিয়ে বিরোধ হয়েছিল লোকেন পালিতের সঙ্গে,[৫০] কেননা তা হলে সমস্ত বস্তুগত কবিতা বাদ পড়ে। এখানেও সেই সমস্যা। যাইহোক, এরপর মলয় বলেন যে, মানুষ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান একটা প্রাণী। তারই জন্য মুখ হাঁ করে তার অপেক্ষা - এটাই ক্ষুধা। তাঁর ভাষায় —

> হাঁয়ের ভেতর গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য, খাদ্য, অখাদ্য, সমস্ত কিছুকে টুপটাপ ফেলে দিতে হবে, দিলে টোটালিটি নিজের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, পরিষ্কার

> হয় মেটাফিজিক্যাল সর্বগ্রাস। ... বেঁচে থাকার কোনো কজ নেই জানার পরেও মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকে, মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যুর জন্যে জীবনপাতী শ্রম করে যায়, বেঁচে থাকে, কারণ, ব্যক্তিজীবনের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে যে ভ্যাকুয়াম, যে ক্ষুধা, যে ওয়েটিং নাথিংনেস, যে অজানা অপেক্ষা, যে যাত্রা, যে ক্ষুধা তা তাকে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে বলেই কবিতার প্রয়োজন হয়।[৫১]

শুধু শূন্যতা বোধ নয়, আতঙ্কের কথাও বলেছেন তিনি। এসব দিক থেকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'সত্য' নিয়েও মলয়ের ব্যাখ্যা আছে। তাঁর মতে সত্য হল 'স্ট্রেট ফরোয়ার্ড চিত্ত বিকার' এবং ভণ্ডামীর উন্মোচক। কেননা, "প্রেমহীন আকস্মিক অনাচারের আচারকে তাই বলা হয় বিবাহ; আর অবিবাহিতা প্রেমিকাকে রক্ষিতা বলা হয়ে থাকে সভ্য সমাজে কৃত্রিম নিয়ম কানুনের ভাঁওতার উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই আধুনিক সভ্যতায়।"[৫২]

মলয়ের মতে কবিতার মধ্যে এক ধরনের সদর্থকতা আছে। 'অস্তিত্বের অ্যাবসার্ড অসুস্থতা' বা শূন্যতার নঞর্থকতা সত্ত্বেও কবিতাসৃষ্টি কালে "সমস্ত শব্দাবলী নতুন ও ভিন্নতর হয়ে ওঠে। পুরাতন পচা ব্যবহৃত চট ওঠা ক্ষয়ে যাওয়া, শব্দ দিয়ে আর কবিতা সম্ভব নয়।"[৫৩] এই যে হয়ে ওঠা, এই যে নতুনত্ব - তা সদর্থক বটে। তাঁর মতে, হাংরি এইসব প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে বা করার চেষ্টায় নিয়োজিত। যখন তিনি বলেন

> আমাদের কবিতা, লিরিক, ওড, ব্যালাড, সনেট পয়ার অনুগত ভাঁড়ামো নয়। আমাদের কবিতা মানে হাংরি কবিতা, স্ট্রেট ফরোযার্ড সত্য, কেননা, প্রতিটি রিপুকে চেতনায় একত্রিত করে তাদের একযোগে বিস্ফোরণ ঘটানোই হল শিল্প। .....কাগজের ওপর পেতে দেওয়া নিজের ছেঁড়া জিভকে আমি হাংরি কবিতার সিনট্যাকস বলি।[৫৪]

তখন অনেকখানি র‍্যাঁবোকে মনে পড়িয়ে দেয়। ১৮৭১ সালে পল দেমিনিকে র‍্যাঁবো পত্রে লিখেছিলেন, From Ennius to Theroldus, from Theroldus to Casimir Delavigue, its all rhymed prose, a game, the enfeeblement and glory of countless idiotic generations এবং

This (new) Language would be of the soul, for the soul containing everything, smells, sounds, colours, thought latching on to thought and pulling.[৫৫]

মলয়ও বলেন, "ঘরের দেয়ালে বসানো পঁচিশটা আয়নার প্রতিফলিত নিজের পঁচিশটা অবয়বের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতে হয় এর মধ্যে কোনটা প্রকৃত আমি। ... শিল্প আত্মীয়তার ব্যাপার, অনুকরণের নয়।"[৫৬] মানে কৃত্রিমতা থেকে স্বতস্ফূর্ততার দিকে যাত্রা। আধুনিকতার একটা ধরণকে অস্বীকার করা। অন্তরাত্মার বহিঃপ্রকাশকে উপজীব্য করা। তাই এযুগে কবিতার প্রয়োজন বেশি করে অনুভব করেছেন তিনি। বলেছেন, "কবিতা বিহীন হয়ে শিল্পবিহীন হয়ে বেঁচে থেকে লাভ?"[৫৭] এতক্ষণ ধরে নিজের আলোচিত বিশ্লেষণকে তিনি পরে একটি দীর্ঘায়িত সংজ্ঞার্থে বিন্যস্ত করেন,

> কবিতা এখন আমাদের পূর্বজদের জীবনের বৈপরীত্যে, আত্মস্থ; সে আর জীবন হতে বিচ্ছিন্ন কমলকামিনীদল চর্চা নয়, অতিপ্রজ অন্ধবল্মীক নয়, নিরলস যুক্তিগ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে অভিভূত যে, জীবনের কোনো অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। জীবনের কোনো মানে নেই। কোনো ষ্টাইল নেই। তাই, এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্ম্যসিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা পৃথিবী বিরোধিতার নয় কেবল, তা মানসিক, দৈহিক, শারীরিক এবং মেটাফিজিক্যাল। এ ক্ষুধার লালনকর্ত্তা কবিতা, কারণ কবিতা ব্যতীত কি আছে আর জীবনে! মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা ছাড়া মানুষের আর কেউ নেই আজ, কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়"[৫৮]

আবার এই কবিতায় মলয় খুঁজেছেন সমস্ত রকম নিষিদ্ধতার মধ্যে অন্তর্জগতের গুপ্তধন, কবিতায় দেখতে চেয়েছেন "বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার মেটাফিজিক্যাল সর্বগ্রাস,"[৫৯] চেয়েছেন "নৈরাত্ম্যসিদ্ধি।" একক ব্যক্তিসত্তার অতল শূন্যতাকে দৃপ্তভাবে অনুভব করতে চেয়েছেন কবিতায়। বলেছেন কবিতার চিত্রকল্প হবে যেন বলাৎকারের দৃশ্যপরম্পরা। এই কবিতাকে তিনি আধুনিক বলতে নারাজ। ঐ শব্দকে তাঁর মনে হয় পুরনো এবং সেকেলে। বলেন, 'আধুনিকোত্তর'

শব্দের প্রতিশব্দে এখানে হাংরি। কবিতা, ব্যক্তির তীব্র অসহ খামখেয়ালের সংযমহীন স্টাইল।"[৬০] কবিতার কাব্যময়তা ও মনন বিলাস উভয়কেই বর্জনীয় মনে করেছেন মলয়। ঈশ্বরভাবনাকে তিনি নস্যাৎ করেছেন, ধর্মকে করেছেন পরিত্যাগ। তাঁর ভাষায় "মধুসূদন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে, নৈঃশব্দ্যকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর 'মেঘনাদ বধ'-এ তাঁর পূর্বজদের সমস্ত মূল্যবোধের নব মূল্যায়ন সূচিত ... একালে, সিডাকশান ছাড়া চার্চে অথবা মন্দিরে মানুষ, যায় না।"[৬১] এই পরিস্থিতিতে মলয়দের আবির্ভাব, তাঁদের হাংরি কবিতার আবির্ভাব। ইতিহাসের প্রেক্ষিতকে মলয় ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে "ধর্মকে টেনে হিঁচড়ে প্রথমে আলাদা করে দিয়ে গেল, র‍্যাশনালিজম, এবং তারপর, রোম্যান্টিসিজম্ ছিঁড়ে পৃথক করে রেখে গেল চেতনাকে। সব শেষ, রাবীন্দ্রিক আইডিয়ালিজমের হাতে মার খেয়ে খেয়ে যার ধকল এখনও চলেছে - কবিতা ক্রমশঃ একটা টোটকায় পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।"[৬২] এমনকি তৃতীয় পর্বে যখন উক্ত দুটি পর্বের দ্বন্দ্বের কাল, যখন সেই কালের একজন অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা বুদ্ধদেব বসু বলেন, "শিল্পমাত্রই রচিত এবং সেই অর্থে কৃত্রিম, কিন্তু আধুনিক কবিতা অন্তত পক্ষে স্বাভাবিকের অভিনয় করে, আর সংস্কৃত কবিতা সদম্ভে ও নির্লজ্জভাবে কৃত্রিমতাকে অঙ্গীকার করে নেয়।"[৬৩] তখন মলয় সেখানে প্রতিবাদ করেন যে বুদ্ধদেবদের কবিতাতেও যথেষ্ট কৃত্রিমতা আছে। আর যে জন্যেই নতুন ধরণের কবিতা, হাংরি কবিতার প্রয়োজনীয়তা। মলয়ের বর্ণনাভঙ্গী এরকম ঃ "এখন এ সময়ে, আমাদের কালে, মানুষ যখন মস্তিষ্ক ও হৃদয় ফেলে দিয়েছে, দিয়ে, নিজের অ্যাবসল্যুট টোটালিটি নিয়ে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক নগ্নমূর্তির মতো দিগন্তের ওপার দু-পা ফাঁক করে, দাঁড়িয়ে গোরিলার মতো দুই হাতে গুম্ গুম্ গুম্ শব্দে চাপড়ে যাচ্ছে তার যন্ত্রণা-দগদগে বুক, শিল্পে আর কৃত্রিমতা সম্ভব নয়, উঁহু। আর সম্ভব নয়।"[৬৪]

চতুর্থ পরিচ্ছেদে এসে মলয় তাঁদের প্রজন্মের কবিতায় কী কী চাইছেন তার একটি ১৪ দফা তালিকা পেশ করেছেন। যথাক্রমে তা এরকম ঃ

১। আমার সম্পূর্ণ আমিত্বের বর্বর আবিষ্কার।

২। কবিতা চলাকালীন আমার সম্মুখে আমাকে এবং আমার সমস্ত কিছুকে যত রকম ভাবে পারা যায় উপস্থাপিত করা।

৩। কবিতায় আমাকে ঠিক সেই মুহূর্তে আটক করে করে দেওয়া যখন আমি কোনো না কোনো কারণে ফেটে পড়েছে আর আমার ভেতর দিকটা বেরিয়ে পড়েছে।

৪। নিজস্ব আমিত্ব দিয়ে প্রতিটি মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ, তারপর স্বীকার অথবা প্রত্যাখ্যান।

৫। সমস্ত কিছুকে বস্তু মনে করে আরম্ভ এবং প্রত্যেকটিকে নাড়িয়ে দেখে নেওয়া প্রাণবন্ত কিনা।

৬। সামনে এসে পড়া ব্যাপারকে অ্যাজ ইট ইজ গ্রহণ না করে তার প্রত্যেকটি দিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা।

৭। পদ্যচ্ছদ ও গদ্যছন্দ উভয়েরই অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটা ষ্ট্রেট-ফরোয়ার্ড নিজস্ব ডিকশনের ব্যবহার।

৮। কথা বলার ধরন হুবহু কবিতায় তুলে ধরা।

৯। কথা বলার সময় শব্দের ভেতরে যে ধরণের ধ্বনি পুরে দেওয়া হয় কবিতাতে সেই ধ্বনিকে আরও চাঁছাছোলা করে রিভিল করা।

১০। পাশাপাশি দুটি শব্দের এতাবৎকালের প্রতিষ্ঠিত আঁতাত ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দেওয়া এবং তদ্বারা অসবর্ণ ও অবৈধ শব্দ এবং বাক্য তৈরী।

১১। বহুল প্রচলিত কাব্যিক শব্দাবলী পরিত্যাগ - কবিতাকে নিজেই অরিজিনাল হতে দেওয়া।

১২। কবিতাই মানুষের সর্বশেষ ধর্ম, সে ব্যাপারটা খোলাখুলি স্বীকার করা।

১৩। অসহ্য অস্তিত্বের বিবমিষা ও ডিসগাষ্ট আগা গোড়া কবিতায় সঞ্চারিত করা।

১৪। ব্যক্তিগত আলটিমেটাম।[৬৫]

পঞ্চম পরিচ্ছেদে মলয় কবিতার ক্ষমতার প্রসঙ্গ তুলেছেন। এই ক্ষমতা হল ভাঙবার ক্ষমতা। নির্মাণের জন্যেই ভাঙচুরের দরকার ঘটে। সমাজ অবশ্য এতে ভয় পায়। কিন্তু কবির তাতে কিছু করবার নেই। কবিতা সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলনা বলেই তা শিল্প। কবিতা-মলয়ের মতে প্রতিক্রিয়া নয়, ক্রিয়া; একটি বিপ্লবী ক্রিয়া। তবে রাজনৈতিক অর্থে নয়। এক ভয়ংকর সময়ের তা নৈরাজ্যলিপি।

ষষ্ঠ এবং শেষ পরিচ্ছেদে মলয় কবিতাকে নিরাদর্শের উপর স্থাপন করেছেন। বাণীবিহীনতা (messagelessness) যে কবির ধর্ম তা বলেছেন। বলেছেন, "মানুষকে এখন উপদেশ দেবার

মতো কিছু নেই, সমস্তই সে জেনে ফেলেছে, ক্লান্ত হয়ে গেছে ওসবে, উত্তরক্লান্ত।"[৬৬] সমাজ, যূথবদ্ধতা, যুক্তিবাদ, বাস্তববাদ সব আজ অর্থহীন, নিষ্ক্রিয়। মলয় বলেন, "প্রাগুক্ত সকল যুগ চলে যাবার পর, শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না, এক বিরাট ক্ষমাহীন সর্বগ্রাস, যার মধ্যে মানুষ একা একা নিজেকে খুঁজে বেড়ায়।"[৬৭] হাংরি জেনারেশনের কাব্য একক মানুষের এই অন্বেষণের কাহিনী - মলয় এমনটাই বলতে চান।

মলয় তাঁর গ্রন্থে এভাবে তাঁর প্রজন্মের নতুন কাব্য দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নয়, নিজেদের উপর মধুসূদন ও জীবনানন্দের ব্যক্তি প্রতিস্বের উত্তরাধিকার অর্শেছেন। তবে অবশ্যই অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণার পটভূমিকায়। একদিক থেকে মধুসূদন ও জীবনানন্দ ছিলেন আত্মঘাতী, হাংরিরাও তাই। জীবন যেহেতু অনিবার্য মৃত্যুর জন্য ক্ষুধার্ত অপেক্ষা ছাড়া কিছু নয় (মলয়ের তত্তানুযায়ী), তাই হাংরিদের কাব্যদর্শন বা তত্ত্বের তিনি নাম দিয়েছেন মৃত্যু মেধী শাস্ত্র। মৃত্যু যেন যজ্ঞ তবে পৌরাণিক অর্থে নয়, উৎসব অর্থে। শুধু মৃত্যু নয়, নৈরাজ্যেরও উৎসব, ধ্বংসের উৎসব। লক্ষণীয়, আরেক হাংরি কবি শৈলেশ্বর ঘোষের একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থেরও নাম 'উৎসব'। যাই হোক, মলয় রায় চৌধুরীর এই গ্রন্থে এ ভাবে হাংরি জেনারেশনের কাব্যতত্ত্ব ও কবির অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'ইস্তাহার সংকলন' মলয় রায় চৌধুরীর দ্বিতীয় তত্ত্ব গ্রন্থে। আসলে, সাকুল্যে নটি ক্ষুদ্রাকৃতি রচনার সমাহার। এগুলির নাম ও প্রকাশ কাল এরূপ - ১) কবিতা - (১৯৬১) ২) উদ্দেশ্য - (১৯৬২) ৩) ছোট গল্প (১৯৬২) ৪) রাজনীতি - (১৯৬৩) ৫) ধর্ম (১৯৬৩) ৬) জীবন (১৯৬১-৬৪) ৭) অশ্লীলতা - (১৯৬৫) ৮) আন্দোলন - (১৯৬৫) ৯) স্বাধীনতা - (১৯৬৫)। এর মধ্যে 'জীবন','অশ্লীলতা', 'আন্দোলন', এবং 'স্বাধীনতা' কে প্রবন্ধও বলা যায়। বাকীগুলো শুধুই প্রচার পত্র। মলয়ের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'মৃত্যু মেধীশাস্ত্রে' ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সালের প্রচারিত ইস্তাহারগুলির একটি সমন্বিত ভাষ্যরূপ পাওয়া যায়। 'জীবন' প্রবন্ধটিকে আবার বলা যায় মলয়ের প্রথম গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ। কেননা 'জীবন' রচনাটিকেই উক্ত গ্রন্থে মলয় বিশদীকৃত করেছেন। এই রচনায় 'কবিতা' শীর্ষক প্রচারপত্রটিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মলয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থের আলোচ্য হতে পারে বাকী সাতটি রচনা। এদেরও মধ্যে আবার 'উদ্দেশ্য', 'ছোটগল্প', 'রাজনীতি' ও 'ধর্ম' হলো নির্দেশ মূলক। 'উদ্দেশ্য' নামক ইস্তাহারটিতে মলয় নয়টি নির্দেশ দিয়েছেন যার সার কথা হল অ্যারিষ্টটলের বাস্তবতাকে নকল না করে নৈরাজ্যমূলক সক্রিয়তা আনতে হবে, নিজের কথা বলতে হবে। নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে ইত্যাদি। 'ছোটগল্প' শীর্ষক ইস্তাহারে ছোটগল্পের নতুন সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন মলয় - "ছোট গল্প আসলে

বর্ণনাবিরোধী সূক্ষ্ম একরকমের চোট, মানুষের ছোঁকপ্রবৃত্তির প্রসার।"[৬৮] কিংবা "আজকের ঠুনকো জীবনের আচ্ছন্ন সক্রিয় অরাজকতার স্ফটিক হয়ে উঠবে ছোটগল্প ঃ দৃষ্টির অতীত যে বিশাল বিস্তৃত বিশ্বাসঘাতী অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ উদ্ভাস তার এলোমেলো খাবল; এটা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা অস্তিত্বের আঘাত নেবার জন্য নিজেদের ক্ষত তুলে ধরেছেন।"[৬৯] 'রাজনীতি' শীর্ষক ইস্তাহারে মলয় জানাচ্ছেন যে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের আত্মাকে রাজনীতি মুক্ত করা হবে। প্রাতিস্বিক মানুষকে বোঝানো হবে যে অস্তিত্ব প্রাক রাজনৈতিক। কোনো ধরনের রাজনীতিককেই শ্রদ্ধা করা হবে না; তাই বলে রাজনীতি থেকে পালানোও হবে না। রাজনৈতিক বিশ্বাসের চেহারাই পাল্টে দেওয়া হবে। 'ধর্ম' শীর্ষক ইস্তেহারে মলয় ঈশ্বরকে জঞ্জাল বলে ঘোষণা করেছেন। ধর্মকে তিনি মস্তিষ্কবিকার ও নেশাও বলেছেন। বলেছেন, 'ধর্ম হচ্ছে বস্তু এবং অবস্তুকে দখলে রাখার মন্তর, তাদের সঙ্গে লেপটে থেকে মানিয়ে নেবার চালাকি।'[৭০] এও বলেছেন যে, নিজের রক্তমাংসে না বেঁচে অন্যের বানানো বিশ্বাসে বেঁচে থাকাই ধর্ম। সুতরাং প্রচলিত এই ধমর্কে মলয় গালিগালাজ করেছেন। পরে, এক নতুন ধর্মের কথা বলেছেন - যা ব্যক্তিবাদী মানবধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, তিনি বলেছেন, "ধর্ম মানে আমার সঙ্গে আমি, আমার আমি, আমার থেকেই আমি, আমার দ্বারা আমি, আমাকে বাদ দিয়ে আমি এবং আমিই আমি।"[৭১] 'অশ্লীলতা' - শীর্ষক ইস্তাহারটিকে পূর্বোক্তগুলোর মত শুধু নির্দেশ বলে একপাশে না রেখে প্রবন্ধরূপেও বিবেচনা করা যায়। এখানে মলয় জানিয়েছেন যে, অশ্লীলতা বলে কিছু নেই। একদল শ্রেণী সচেতন ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিষ্ঠানিক মুরুব্বী তাঁদের শ্রেণীগত সংস্কৃতি ও ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে বাঁচাতে এই অশ্লীলতার তত্ত্বটি নির্মাণ করেছে। মলয় বলেন, "সমাজের মালিকেরা একটা নুলো ভাষা তৈরী করে, নীচু শ্রেণীর শব্দাবলীকে অস্বীকার করতে চায় যাতে বিভেদ রেখাটা পরিষ্কার থাকে।"[৭২] বলেন, "অশ্লীলতা অভিজাতদের সংস্কার যারা নীচুতলার উন্নত সংস্কৃতির কৃষ্টি আক্রমণকে ভয় পায়। ... অভিজাতের কাছে নীচুতলার ভাষা অশ্লীল। অভিজাতের কাছে তার নিজের ভাষা মানে শিল্প।"[৭৩] মলয় মনে করেন, সমগ্র সমাজের সাধারণভাষার কথা বলা যদি কলুষতা ও বিকারহয়, অশ্লীলতা হয় তাহলে অশ্লীলতাই কাম্য। 'মানুষ ও মানুষের মধ্যে পার্থিব দখলী সত্ত্বের ভিত্তিতে কোনো তফাৎ করতে' তিনি দেবেন না। মলয়ের মতে উচ্চবিত্ত বুর্জোয়ারা যৌনতাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখান 'যৌনমাংসের তেলতেলে গন্ধ ছাড়া এই সমাজে কোনো বিজ্ঞাপন সফল নয়। .... প্রতিটি পদক্ষেপে অবশ্যম্ভাবী যৌনজাল কেননা এই সমাজ ব্যবস্থা ক্রেতা-বিক্রেতার তৈরী।"[৭৪] তথাপি যৌনতা নিয়ে কেন অবদমন, কেন নৈতিকতার প্রশ্ন? কারণ যৌনজীবন সরল,

স্বাভাবিক হয়ে উঠলে বুর্জোয়াদের পুঁজিকেন্দ্রিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। যৌনতাকে পুঁজি করতে পারবেন না তারা। তাই যৌনতাকে পুঁজি ছাড়া অন্য কোনোভাবে তাঁরা প্রযুক্ত হতে দেবেন না। তাই অশ্লীলতার ধুয়ো। মলয় এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অশ্লীলতার মিথ্যাচারকে তিনি তাচ্ছিল্য করেছেন। বলেছেন, "আমার যেমন ইচ্ছে সে রকম ভাবে লিখবো এবং সমগ্র মানব সমাজের শব্দভাণ্ডারে আমার ভাবনাকে ডুবিয়ে দেবো।"[৭৫] অশ্লীলতাকে মলয় জীবনের সামগ্রিকতারই একটি অংশ হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন।

'আন্দোলন' রচনায় আমৃত্যু কবিতাপ্রাণতার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কবিতা ব্যক্তির শরীরে আত্মার মত মিশে থাকে। কবিতা সজীব একটি সত্তা। জীবিত লেখাই কবিতার ব্যাপার; জীবিত শিল্প কবিতা মাত্রই আন্দোলনের ব্যাপার। এই প্রবন্ধের কবিতা তত্ত্বের অনেক কথাই মলয় প্রথম গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। সেদিক থেকে প্রবন্ধটি পুনরুক্তিমূলক। যেমন, এখানে কবিতায় আমিত্বের উন্মোচনের কথা বলা হয়েছে। মলয়ের ভাষায়, —

> "ব্যক্তির নিজের জীবনই যথেষ্ট। কল্পনা অর্থাৎ বানানো গালগল্প ঢুকিয়ে কবিতার বাহার খোলবার দরকার আজকের দিনে আর নেই। ... কবিতা জিনিস বা বস্তু দিয়ে লেখা হয় না। যা জিনিস বা বস্তু বা দ্রব্য তা স্থাবর, জড়পদার্থ। 'আমি একা, সম্পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ, ফলে চূড়ান্ত স্বাধীন থাকার জন্যে পরিত্যক্ত, বিতাড়িত এই বোধ থেকেই কবিতা।"[৭৬]

এখানে মলয় কবিতায়, প্রতীক, চিত্রকল্প ব্যবহার তুলে দেবার কথা বলেছেন, বলেছেন নাগরিকতাকে বিসর্জনের কথা। স্বসময়ের আগুনে কবিকে তিনি ঝলসে উঠতে বলেছেন। এখন কবিতা শূন্যতার পরিসরে বাড়বে। জন্মের আগের যে শূন্যতা এবং মৃত্যুর পরের যে শূন্যতা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকটাকে কবি বাড়াবেন। সমাজ চৈতন্য, সমাজ বাস্তবতা বলে কিছু থাকবেনা। শুধু থাকবে ব্যক্তিচৈতন্যের বাস্তবতা। প্রতিটি কবিতা হবে আরেকটির থেকে আলাদা, একই ধরনের কবিতা হতে পারবেনা। প্রতিটি কবিতা-ই নিজেকে আলাদ করে চেনাতে সক্ষম হবে। যেমন, গলার আওয়াজ শুনে, পদশব্দ শুনে আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে চেনা যায়, প্রতিটি কবিতাকেও যেভাবেই সনাক্ত করা যাবে। মলয়ের মতে ত্রিশের দশকের পর থেকে বাংলা কবিতার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ তা আগে থাকতেই তিরিশের কবিদের লেখায় কোনো না কোনোভাবে ছিল। এজন্যেই হাংরি আন্দোলন, কবিতার জন্যে। সামাজিক অভূতপূর্ব হিংস্রতা এবং ইন্দ্রিয়ের

অসংযুতিতে তাঁদের নতুন কবিতা রচনা - চর্চা নয়। কারণ চর্চায় মেধা প্রয়োজন - যার প্রয়োজনীয়তা মলয় অনুভব করেন না। তিনি বলেন, "যে কবি, সে যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে প্রথমে ওঠে ওই ইন্দ্রিয় এবং তারপর ওঠে মেধা। মৃত্যুকালে আগে মরে মেধা এবং ক্রমশ ইন্দ্রিয়।"[৭৭] যাই হোক, এখানে মলয় তাঁর কাব্য দর্শনেরই একটা আদল উপস্থাপিত করেছেন।

গ্রন্থের শেষে ইস্তাহার 'স্বাধীনতা'। এখানে কবি, লেখকের স্বাধীন সত্তাটি কী রকম হবে মলয় তাই বলতে চেয়েছেন। প্রথমেই তিনি জানিয়েছেন লিখতে হবে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে। মানে সামাজিক আইন কানুনের তোয়াক্কা করা চলবে না। অতীতের উত্তরাধিকার এবং চলতি আঙ্গিক দুটোকেই করতে হবে নিশ্চিহ্ন। লেখার মধ্যে থাকবে — "অধর্মাচরণ, অন্তর্ঘাত, প্রতিশোধ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রত্যাখ্যান, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার, গ্রন্থিচ্যুতি।"[৭৮] জানোয়ার আর উদ্ভিদের মতন জৈবিক হতে হবে কবিকে।"[৭৯] এখানে হেনরি মিলারের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন মলয় ঃ I do not call poets those who make verses rhymed or unrhymed. I call that poet who is capable of profoundly altering the world.[৮০] উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আঁতোয়া বার্তোর 'The poet is a man who prefers to go mad in the social sense of the word, rather than forfeit a certain higher idea of human order.[৮১] এই যে উন্মাদনা, সমস্ত বিশ্ব বদল করবার তীব্রতা কবিদের মধ্যে সেটাই কবিদের স্বাধীনতা, আর তা কবিতার জন্যে প্রয়োজনীয়। মলয়ের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী হাংরি কবিতার জন্যে বিশেষ করে। তিনি আরও বলেন, "ক্ষুৎকবিতা পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে লেখা থেকে বিষয়কে লোপাট করে দেয়া দরকার।"[৮২]

> এখানে মলয় নিজেদের আন্দোলনকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। প্রতিবাদী ও স্বাধীনচেতা হিসেবে জাহির করতে চান। এঠা খুব জরুরীও বটে, কারণ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতাকে যারা পরোয়া করে না, অথচ বুর্জোয়া আত্মাভিমানে যারা ডগমগ তারাই কেতাবী কবিতার ওস্তাদ আর চেলা - এই সব কেতাবী হেদাহেদিকে নিকেশ করার জন্যে চাই উদ্দেশ্যহীন এক বৈপ্লবিক অবস্থায় নিজের চরিত্রকে তাতিয়ে তোলা। স্বাধীনতা পেতে হলে পাগলামী দরকার। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার নয়। স্বাধীনতার জন্যে বরদাস্ত করতে হয় ধ্বংস অবমাননা প্রতিরোধ। ... গতানুগতিক মানুষের দুর্বলতা, ভয় আর পেটি

হামবড়াই থেকে কবিকে ছিঁড়ে ছন্নছাড়া করে এই স্বাধীনতা, যেমন করে ভাষা, রাষ্ট্র সংস্কৃতি, ইতিহাস, নিয়মের ঐতিহ্য থেকে। এই স্বাধীনতা কব্জা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।"[৮৩]

বিশেষ করে যাঁরা কেতাবী সাহিত্য করেন তাঁরা তো স্বাধীনতাই চান না। তাঁরা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের আনুগত্যে মুচলেকা দিয়ে নিরাপদ জীবন কাটান — আশার বাণী শুনিয়ে যান শুধু। মলয় ঐ সব সাহিত্যের গুরুত্ব স্বীকার করেন না। কবিতা মানেই স্বাধীনতার চেতনা, কবিতা মানেই আন্দোলন প্রবন্ধকার এ প্রবন্ধে সেটাই বলতে চান ঃ "আমি মনে করি, কবিতা দেশবদল, পৃথিবীবদল জন্মবদল শরীরবদল, সভ্যতাবদল এবং এই সংকল্প ফেরত নেওয়া যায় না। পাঠককে প্রতিকূল করে দিয়ে ভাষার ও মনোভাবের সাহায্যে কলঙ্কিত ও প্ররোচিত না করতে পারলে তার ওপরে ছেয়ে যাওয়া যায় না। কবিতা আসলে হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক সৃজনশীলতা। অরাজকতা নয়। অভ্যুত্থান।"[৮৪]

লক্ষণীয়, দুটি বইতেই মলয় কবিতাকেই আলোচনার মুখ্য উপজীব্য করেছেন। ছোটগল্প, রাজনীতি বা সামাজিক প্রসঙ্গগুলি এসেছে যৎকিঞ্চিৎ। এমনকি হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রবন্ধ, নাটিকা ইত্যাকার রচনাগুলিকে কোনো তাত্ত্বিক মান্যতা দেবার প্রয়াস পাননি। তার কারণ, সম্ভবতঃ এই যে, হাংরি জেনারেশন মূলত কাব্য আন্দোলন। বিশেষত, কবিতা রচনার জন্যই হাংরিদের কারাবাস করতে হয়েছিল। অথবা বলা যায়, কবি হিসেবেই হাংরিদের পরিচিতি ব্যাপকতা পেয়েছে। সে যাই হোক, মলয়ের এই গ্রন্থ দুটিকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রথম সূত্রধার বলতে হবে।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের আরেক পুরোধা শৈলেশ্বর ঘোষও নিজেদের আন্দোলনের লক্ষ, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিয়ে বক্তব্য বিস্তার করেছেন। ১৯৬৮ সালে প্রথম বেরোয় তাঁর 'মুক্ত কবিতার ইস্তাহার'। ইস্তাহারটি এরূপ —

মুক্ত কবিতার ইস্তাহার

- কবিতা চেতনার সম্প্রসারণ - অজ্ঞাত জগতের আবিষ্কার। কবিতার এছাড়া অন্য উদ্দেশ্য নাই।
- কবিতা মানুষের শেষ ধর্ম।

বুদ্ধ যীশু রামকৃষ্ণ নয় - কবি / কবিতা পৃথিবীকে স্বাধীন মুক্ত করতে থাকবে

ক্রমশ ঃ

- কবিতা ব্যক্তি মানুষকে পুনরভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে যায়।
- কবিতা অপরাধ চেতনা থেকে জেগে ওঠা গ্লানিহীন আত্মার সংগীত — অন্ধকারে ফুটে ওঠা ফুল।

১. সমস্ত ভণ্ডামীর চেহারা মেলে ধরা।

২. প্রকৃতির দাসত্ব না করা।

৩. শিল্প নামক তথাকথিত ভূষিমালে বিশ্বাস না করা।

৪. আপাদমস্তক কেবল নিজেকেই ব্যবহার করা।

৫. এস্টাব্লিসমেন্টের চাকর না হওয়া।

৬. যে কোন প্রতিষ্ঠানকেই ঘৃণা করা।

৭. মানুষী অভিজ্ঞতার শেষ সীমা দেখে নেওয়া।

৮. সভ্যতার নোনা পলেস্তারা মুখ থেকে তুলে ফেলা।

৯. সত্যকে সরাসরি বলা।

১০. যুক্তির স্তর পার হয়ে গিয়ে দ্রষ্টা হিসাবে জীবনকে দেখা ও প্রকাশ করা।

১১. সাধারণ কথ্য ভাষাকে ব্যক্তিগত করে দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহার করা।

১২. যা কিছু গড়ে তোলা হয়েছে তাকে সন্দেহ করা।

১৩. অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্যকে ধরবার কোন উপায় নাই শুদ্ধু বুদ্ধি জীবন সত্যকে ধরতে পারে না।

১৪. সমাজ যেসব শব্দকে অশ্লীল বলে বর্জন করে এবং যে চিন্তাকে দূষণীয় বলে ধিক্কার দেয় তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমসাময়িক জীবনের অনেক সত্য। এ গুলিকে ব্যবহার করা।

১৫. নিজেকে ক্রমাগত ভাঙ্গা এবং মেলে ধরা।

১৬. নিজেকে দেখাই জগৎকে দেখা। দেখাই জ্ঞান।

১৭. অস্তিত্বের গোপনতম প্রদেশে লুকান যা কিছু যা ক্রমাগত মানুষকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়, মুখোসের দিকে নিয়ে যায় তাকে প্রকাশ করা।

১৮. জীবনের ভয়ানক রিলেশনগুলি প্রকাশ করা।

১৯. যে জীবন দেওয়া হয়েছে তাকে ত্যাগ করে আবার নিজের স্বরূপের কাছে চলে আসা এবং সৃষ্টির মূল নিয়ম ওগতির সংগে নিজেকে যুক্ত করা।

২০. চেতনাকে অরাজক করে তুলে, বুদ্ধির জগতের বাইরে বোধের জগতে চলে যাওয়া।

২১. নার্ভম মাথা ও সংবেদন শক্তিকে পর্যুদস্ত করে তান্ত্রিকের মত উঠে দাঁড়াতে হবে।

২২. অস্তিত্বের কেন্দ্রগত ভয়ের মূল বিন্দুকে স্পর্শ করা।

২৩. মধ্যবিত্তের রুচি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করা।

২৪. সমস্ত বুর্জোয়া শিক্ষাকে অস্বীকার করতে হবে।

২৫. মৃত্যু আর যৌনতা, যা মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, লেখায় সেই রুদ্ধ চেতনাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া অবসেসনগুলিকে লেখায় মুক্তি দিতে হবে - সেটাই বুর্জোয়ার বিপদ

২৬. পৃথিবীর সংগে এবং নিজের সংগে ভয়ংকর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে - তাকে প্রকাশ করতে হবে নিষ্ঠুরভাবে।

২৭. জীবনকে ত্যাগ করে নয়, জীবনের কাদামাটি অশ্লীলতার মধ্যে ঢুকে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসা।

২৮. জীবন বিরোধী এই সভ্যতায় নিজেকে করে তুলতে হবে প্রতিবাদের মূর্ত্ত প্রতীক।

২৯. বুর্জোয়ার সুখ ও সিকিউরিটির উপর পেচ্ছাপ করে দিতে হবে।[৮৫]

লক্ষণীয়, মলয়ের ইস্তাহারের সঙ্গে শৈলেশ্বরের ইস্তাহারের কিছু বক্তব্য গত সাদৃশ্য আছে। কারণ, মলয়ের মতই তিনি বলেন, কবিতা মানুষের শেষ ধর্ম, কবিতা ব্যক্তিকে পুনরুভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে যায়। কবিতায় সত্যকে সরাসরি বলতে হবে, বুর্জোয়া চেতনা ও সমাজকে আঘাত করতে হবে; মানুষের সমস্ত স্বাধীনতার অপহারক মৃত্যু ও যৌনতার রুদ্ধ চেতনাকে মুক্তিদান করে

পুনর্বার স্বাধীনতা ফিরে পেতে হবে ইত্যাদি। বস্তুত মলয় ও শৈলেশ্বরের বক্তব্যে তেমন গুণগত পার্থক্য নেই, শুধু কিছুটা মাত্রাগত ফারাক আছে। মলয় শুধু নৈরাজ্যের কথা বলেছিলেন, শৈলেশ্বর বলেছেন, অপরাধ চেতনারও প্রতিফলন আবশ্যক। মানুষী অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় পৌঁছতে চেয়েছেন শৈলেশ্বর। প্রতিধ্বনিকে ঘৃণা করার কথা বলেছেন। জীবনের ভয়ানক সম্পর্কগুলোকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও রুচিকে ভাঙতে চেয়েছেন। প্রকাশভঙ্গীর নির্মমতা ও ভয়ংকরত্ব চেয়েছেন। অপরাধ প্রবণ চিত্তের প্রবণতা ও প্যাশন দিয়ে কবিতায় একটি তীব্র আঘাত করবার কথা বলেছেন। আর যুক্তির স্তর পার হয়ে তিনি কবিকে দ্রষ্টায় পরিণত করতে চেয়েছেন। তবে তিনি এগুলোকে মলয়ের মতো বিলি করেন নি - পত্রিকায় ছেপেছিলেন মাত্র। মলয় যেন একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগোন - তাঁর প্রজন্মের কবিতা তথা সাহিত্যের তত্ত্ব নির্মাণ করবেন বলে। আর শৈলেশ্বর নিজেদের লেখা লেখির আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কলম ধরেন। দু'জনেরই গন্তব্য এক কিন্তু পদ্ধতি আলাদা। তাই শৈলেশ্বরের এই রচনাগুলো বিভিন্ন বিষয় ও প্রসঙ্গে লেখা কিছু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যেন। সেই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে তাঁর মন্তব্য, মতামত গুলোকে আলাদা করে সাজিয়ে নিলে তবেই হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মতাদর্শ হিসেবে সেগুলি স্পষ্টতা পায়। শৈলেশ্বরের এ ধরণের রচনার সংখ্যা ১৪টি। এগুলির শিরোনাম এরূপ ঃ (১) কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ/১ (২) কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ/২ (৩) কবির বিশ্বরূপে (৪) যে কেউ আমার লেখা পড়বে (৫) শিল্প ও সত্য (৬) চরিত্রহীনতার প্রয়োজন (৭) ভাষার জীবন ও মৃত্যু (৮) কেন লেখা (৯) কবিতার অভিযাত্রা (১০) প্রেত প্রতিরোধ (১১) কবিতা আপনার আতঙ্ক (১২) জীবন প্রতিষ্ঠান (১৩) নিজের আবিষ্কৃত সত্য (১৪) আমাদের অভিজ্ঞতা।

পূর্বোক্ত ইস্তাহারটি এবং এই চৌদ্দটি রচনা ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত যুষ্ট, নিষাদ, ক্ষুধার্ত, জিরাফ, বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পত্রিকার নানা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে, ১৯৮৪ সালে গ্রন্থাকারে একসঙ্গে প্রকাশ পায়। গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়, 'প্রতিবাদের সাহিত্য।' প্রকাশ করে শিলিগুড়ি'র 'ধৃতরাষ্ট্র পাবলিকেশন।'

যাই হোক, এই গ্রন্থে শৈলেশ্বর, কবি ও কবিতা সম্পর্কে, লেখক ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে, বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্কে, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবাদ সম্পর্কে, বাস্তবতা ও সত্য সম্পর্কে, সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে প্রেম ও যৌনতা সম্পর্কে, জীবন ও সৃজনশীলতা সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন মোটামুটি তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে শৈলেশ্বর নির্দেশিত হাংরি

জেনারেশন তত্ত্বাদর্শ।

প্রথম প্রবন্ধ 'কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ/' - তে পাচ্ছি কবি'র স্বরূপ ঃ

> বিদ্রোহী কবি বলে কোনো পদার্থ আছে কি? নিশ্চিতভাবেই নেই। কেবল কবি আছে, কবি শব্দই বিদ্রোহবাচক, কারণ জীবনের ষড়যন্ত্রময় বস্তুসমূহের মারাত্ম অবস্থানকে যে মেনে নিতে অস্বীকার করে ও বেঁকে বসে সেই কবি।[৮৬]

এরপর পাচ্ছি কবিতা কেন জীবনের একটা সদর্থক শক্তি তার ব্যাখ্যা ঃ

> আমি যখন মনে করি, অমি লিখি - তখন আমি লিখি না। আমার মধ্যে কাজ করে চলেছে হাজার হাজার বছরের অতীত লক্ষ মানুষের সম্মিলিত চিন্তা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জৈব বন্ধনগুলি আমার ধারণাগুলি নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে তারাই, আমার অস্পষ্ট অবচেতনার সেই পোকাগুলি কিলবিল করছে - যেগুলি আমাদের পিতৃ-অনুক্রমে বাবা মা'দের মধ্য দিয়ে সকলেরই মগজে ঢুকে পড়ে।[৮৭]

আবার এখানেই বিপদ। নিজেকে, নিজের উত্তরাধিকারকে অতিক্রম করা, যেটুকু পাওয়া গেছে তাকে ভেঙে ফেলে, অস্বীকার করে, নতুন করে গড়ে তোলবার ক্ষমতা। অথচ কবি মুক্তিকামী। শৈলেশ্বরের মতে, কবি একদিকে প্রচলিত শব্দকে নষ্ট করবে, অন্যদিকে নিজের শরীরকে কবিতায় নতুন ভাবে আবিষ্কার করবে। কারণ, ''ক্ষুন্নিবৃত্তিগত শরীর জৈববিধিগত শরীরের মধ্যেই সমস্ত সত্য লুকিয়ে আছে।''[৮৮] এবং ''বুর্জোয়া শিল্প এমন এক বস্তু যা আমাদের চৈতন্যকে প্রসারিত করে না, অভিজ্ঞতার স্তরের কোনো রূপান্তর ঘটায় না, শরীর থেকে কোনো প্রকৃত শরীরের সূত্রপাত করে না।''[৮৯] অথচ ''এই শরীর থেকেই এক প্রকৃত শরীরের সূত্রপাত হচ্ছে - এবং তাই হল কবিতা।''[৯০] বলেন,

> আমাদের কাছে টলষ্টয়ের চাইতে ডষ্টয়েভস্কি এই জন্যই সত্য, সুধীন দত্তের চাইতে জীবনানন্দ, সত্য মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জাঁ জেনে এবং ব্রেতোর চাইতে আর্তো। তীব্রতম চৈতন্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে

> তারা জীবনের মূলতম সত্যে পৌছাতে চেয়েছেন, নৈরাজ্যের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন পরম শৃঙ্খলা, পাপের মধ্যে ধর্ম এবং কেবল মেধাকে বিশ্বাস না করে সমস্ত শরীরের মধ্যে জগতের সত্য নিয়ম খুঁজে পেয়েছেন।

শৈলেশ্বর তাঁদের কবিতার আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, কবিতা হচ্ছে এক ধরণের সামগ্রিকতার আভ্যন্তরিন শক্তি। সমস্ত শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেকার নিহিত শক্তি। তা সমাজ ও জীবনের কোনো বিশেষ একটি দিকের প্রকাশ বা অনুরণন নয়। তাই বলেন,

> প্লেটো থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ইনকুইজিশানবাদীরা সকলেই একই পাপে পাপী, তাঁরা মনে করেছিল রাজনীতি জীবনের একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থ বিষয় ঈশ্বর বা প্রেত খানিকটা, সময় খানিকটা, শিল্প খানিকটা কিন্তু জীবনের সেই সত্য, যা এইসব কিছু আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও এক দুর্জ্ঞেয় শক্তিকে ধরে রাখে যার নাম জীবন এবং যার নাম আমি বলি কবিতা।[৯১]

কবিতার সপক্ষে, বিশেষতঃ হাংরি কবিতাদর্শের পক্ষে এইসব কথা বললেও রচনাটির নাম 'কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' এই জন্যে যে অকবিতাকেও কবিতা বলে প্রচারের বিরুদ্ধতা রয়েছে এখানে। জীবনানন্দ ব্যতীত ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ যাটের অন্যান্য কবিদের জনপ্রিয় কবিতাবলীকে অগ্রাহ্য করেছেন শৈলেশ্বর। এমনকি জীবনানন্দেরও 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলী বা 'বনলতা সেন' শীর্ষক কবিতাগুলিকেও তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা বলেছেন তিনি। অভিজ্ঞতা ও চৈতন্যের ভয়াবহতা নেই ঐ সব কবিতায় - এরকম মনে হয়েছে তাঁর। তিনি মনে করেছেন জীবনানন্দের অস্তিত্বের জটিলতা প্রকাশক কবিতাগুলিই একমাত্র গ্রাহ্য। নতুন কবিতাও হবে তারই উত্তরসাধক ঃ "মানুষ রচনা করে মৃত্যুর গান অনুশোচনা ও ভয়কম্পন শিল্প হল সেই অতীত বস্তু যা জীবনের রক্তস্রোত নষ্ট করে মানুষ এখন থেকে রচনা করবে জীবনের গান ও আনন্দের শব্দ প্রবাহ।"[৯২]

'কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ/২' রচনাতেও শৈলেশ্বর এই নতুন কবির স্বরূপকেই কাব্যময়ী ও জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আবেগ ও ইঙ্গিতের নির্মোক সরালে বোঝা যায় - নতুন কবি গোপনতার উদ্ভাসন চান - সেই গোপনতার মধ্যে কামনা বা অপরাধ সব কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে। এই কবি শুধু নাস্তিক নন, তিনি ঈশ্বরের নিন্দাকারী। তিনি আক্রমণকারী, স্বাধীনতাস্পৃহ,

নির্লোভ, নিঃস্বার্থ আবার প্রেমিক। সত্যের জন্য তাঁর অনবরত যুদ্ধ। প্রতিটি শব্দের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করবার জন্য উদ্দাম। এখানে প্রবন্ধের একটু ভাষার নমুনা দেওয়া হল : "সত্য আমার কাছে স্বপ্ন, কারণ তোমাদের মিথ্যা পৃথিবীতে তো সত্য নেই - আমি যা রচনা করি তা আমার কাছে স্বপ্ন, আমি যা রচনা করি তা আমার ঘৃণা, আমি যা রচনা করি তা আমার ক্রোধ - আমি যা রচনা করি তা আমার ভালবাসা।"[১৮]

'কবির বিশ্বরূপ' প্রবন্ধটি 'জিরাফ ১৯৮৩' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি কিভাবে বিশ্বের সঙ্গে কবিতার সেতু রচনা করেন এবং বিশ্বের, সমাজের সঙ্গে তার ব্যক্তিসম্পর্কই বা কীরকম তা এক অননুকরণীয় ভাষায় শৈলেশ্বর এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধটিতে আধুনিক মানুষের স্ববিরোধকে লেখক স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ঐ স্ববিরোধ থেকে যে কবি-ই বেরোতে পারেন সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। লেখক বলেছেন যে, যতক্ষণ না আমরা হৃদয় খুলে দেখাতে পারব ততক্ষণ আমাদের মুক্তি অসম্ভব। আমরা স্বাধীনতার কথা বলি, কিন্তু স্বাধীনতাতে ভয়ও পাই। নিজে স্বাধীনতা পেলেও অন্যের স্বাধীনতার প্রয়াসকে সমর্থন করি না। বলেন,

> আমাকে যদি আদর্শ আর আদর্শহীন গতি দুটোর মধ্যে বেছে নিতে হয় বলা হয় তবে আমি দ্বিতীয়টিকেই বেছে নেব ... যদি আমাকে নৈতিকতা এবং আত্মার নৈরাজ্য এ দুটোর মধ্যে বেছে নিতে বলা হয়, তবে অবশ্যই আমি দ্বিতীয়টাকেই বেছে নেব, কারণ সমস্ত নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে আর কোনো তথাকথিত নৈতিকতার মধ্যে ঢুকতে পারি না, যে মুহূর্ত গুলিতে আমি বেঁচে থাকার আনন্দ পাই সেই মুহূর্ত গুলিতেই আমি পরিপূর্ণ এবং শুদ্ধ নৈতিকতা শুদ্ধতার পরিপন্থী। ... ভালবাসা ও ভালবাসাহীন অস্তিত্বের মধ্যে, আমি পেণ্ডুলামের মত চলাচল করি। ভালবাসায় যেমন আমি পূর্ণ হয়ে উঠি তেমনি ভালবাসাহীনতাও আমার অস্তিত্বের এক সত্য কিন্তু ভালবাসাহীনতাই আমার শূন্যতা যাকে পরিপূর্ণ করা অর্থদান করা আমার কাজ।"[১৯]

শৈলেশ্বর বলেন, "ভালবাসা জীবনের স্বাভাবিক এবং নৈসর্গিক পরিস্থিতি নয়, ভালবাসা হল মানুষের শুদ্ধতার আকাঙ্খা।"[২০] বেঁচে থাকার সার্থকতা, ভালবাসা এ সমস্ত কিছু পেতে হলে স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে। আর

> নিজেকে ছাড়া কে আমাকে স্বাধীনতা দেবে নিজেকে ছাড়া কে আমাকে বন্দী করবে। রাষ্ট্র, সমাজ এরা কিছু স্বাধীনতা দেয় কিছু কেড়ে নেয় - কিন্তু আমি নিজেকে যে স্বাধীনতা দিই, তা আমি ছাড়া আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আমি যখন বন্দী হয়ে থাকি তখন আমি ছাড়া বাইরের কোনো শক্তিই আমাকে মুক্তি দিতে পারে না।[৯৬]

সুতরাং কবির প্রথম পরিচয় হল তিনি একজন স্বাধীন মানুষ। আর "কবিতা, এই স্বাধীনতার চেতনা, মানুষের আত্ম আবিষ্কার।"[৯৭] আত্ম-আবিষ্কারের জন্য ব্যক্তিকে সংস্কার ভাঙতে হবে, ইন্দ্রিয় সংকোচ ত্যাগ করতে হবে, শব্দরাজীকে মুক্ত করতে হবে ঘেরাটোপ থেকে। ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

> বস্তুগুলি স্থানচ্যুত করলে তাদের অর্থ ও প্রকৃতি পাল্টে যায় সৃষ্টি হয় নতুন তাৎপর্য; তাদের লুকানো মুখ স্পষ্ট হয় কবি হিসেবে মনে করি এটাই আমার প্রথম ও প্রধান কাজ। আমি যদি পৃথিবীর একটা কণাও তার পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে না পারি তবে আমি মানুষকে কী জানাব? আমি যদি নতুন অর্থ খুঁজে না পাই তবে আমার চোখ কী দেখল? .... পুরনো আমির খোলসটা ছাড়তে হয় ঠিক সাপের মত আমার লেখায় তাই থাকে ঐ খোলস ছাড়ার সময়ের অভিজ্ঞতা এবং তারপর যে নতুন জগতে প্রবেশ করি শব্দই বহন করে এই চেতনা স্তর চেতন অবচেতনে মেশামশি, এক আলো আঁধারি।[৯৮]

লেখক বলেন যে, কবি একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং চেতনাস্বরূপ। কখনও সে পুরোটাই ইন্দ্রিয় যখন সে জগৎকে নিজের ভিতরে গ্রহণ করে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাই রূপান্তরিত হয় চেতনার ইন্দ্রিয় আর চৈতন্য - এই দুই মেরুতে তার অস্তিত্ব ক্রমাগত ধাক্কা খায়। শৈলেশ্বরও তাঁর প্রবন্ধে ইন্দ্রিয়সমূহের সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়ে কথা বলেছেন কিন্তু র‍্যাঁবোর অর্থে নয়। র‍্যাঁবো ঐ বিপর্যয় থেকে হ্যালুসিনেশানে গিয়েছিলেন আর শৈলেশ্বর এক নতুন চেতনার কথা বলেছেন। জীবনের চেতনা, নক্ষত্রের মত ব্যাপ্ত ও আলোকোজ্জ্বল। কবির এই চেতনা থাকে বলেই, প্রচলিত সমাজ ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে ভয় পায়। লেখক বলেন, "আমার কাছে কবিতা এক প্রচণ্ড শক্তি যা আমার অভিজ্ঞতা চেতনা থেকে নির্গত হয়ে সমস্ত জগৎকে আক্রমণ করে এবং তাকে বদলাতে

চায়।"[৯৯] যে কবির এই চেতনা আছে, যিনি সভ্যতা ও মানবপ্রকৃতির ষড়যন্ত্র ধরতে পেরেছেন স্বীয় প্রাকৃত অভিজ্ঞতায় তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সার্থক। যে অর্থে তাঁর মতে জীবনানন্দ সার্থক, আর বিষ্ণু দে ব্যর্থ। এ কাজে শব্দ ব্যবহারের ছুঁৎমার্গতাও তিনি ত্যাগ করতে বলেন।

'যে কেউ আমার লেখা পড়বে' প্রবন্ধে শৈলেশ্বর তাঁদের লেখার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। যদিও বলেছেন যে, নিজেদের লেখাকে 'জাষ্টিফাই' করার দরকার হয় না। কিন্তু 'ক্ষুধার্ত - প্রথম সংকলনে কবি নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যেহেতু মোহিতকে কোনো প্রতিষ্ঠানের অংশভাক বা বিচারক বলে তাঁর মনে হয় নি সেজন্যে, একজন পাঠকরে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটাতে চেয়েছেন। পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক, সমালোচকদের দ্বারা হাংরি কবি লেখকরা যে নিন্দা ভর্ৎসনা লাভ করেছিলেন তারও বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ এখানে শৈলেশ্বর করেছেন। মোহিতের প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল, হাংরিরা তাঁদের কবিতার দ্বারা বুর্জোয়া পদ্ধতিকেই স্বীকার করেছেন কিনা। শৈলেশ্বর বলেন যে, যদি তাই হতো তাহলে বুর্জোয়া মিডিয়ায় হাংরিদের কাব্যের আলোচনা, প্রতিষ্ঠানিক কাব্য সংকলনে তাঁদের কবিতার অন্তর্ভুক্তি এগুলোও ঘটত। আত্মার উলঙ্গ অবস্থা, স্বাধীন নির্দেশ বুর্জোয়ারা সহ্য করে না। বুর্জোয়া শিল্পের ইমেজ ব্যবহারের অভিযোগ হাংরিদের সম্পর্কে মোহিত তুললে শৈলেশ্বর বলেন, "বুর্জোয়া যে গ্লাসে সরবত রাখে, আমি সেই গ্লাসে বিষ রাখি।"[১০০] মোহিতের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা — সোজাসুজি বলা (Direct expression) কী? শৈলেশ্বরের উত্তর, — "আমার ভাষা চেতনার নৈরাজ্য এবং অবচেতনার গাঢ় রাত্রি প্রকাশ করে ... চরম অভিজ্ঞতার ফল হলে সব লেখাই direct আমার কাছে স্বপ্নও direct অভিজ্ঞতা এবং সত্য। Indirect লেখা মাথার লেখা যার মধ্যে রক্ত মাংস নাই, রক্তমাংস ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে সত্য আছে বলে আমি মনে করি না।"[১০১] হাংরি জেনারেশন একটি আলাদা সমাজ কিনা এর উত্তরে শৈলেশ্বর বলেন যে, তাঁরা কোনো সমাজ গড়ে তোলেন নি, প্রত্যেকে নিজ নিজ মতো স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। এভাবে মোহিতের প্রশ্নগুলির উত্তরে লেখক যা জানান তা এরকম। শুধুমাত্র সামাজিক মূঢ়তাকে আঘাত করা নয়, নিজেকে সঠিকভাবে মেলে ধরতে পারলে তা থেকেও একটা তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়। যৌনতা এবং মৃত্যুই মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে। সুতরাং স্বাধীনতা মানে চৈতন্যের ঐ দুটি অবসেসন থেকে মুক্তি। এটাকে মোহিতের মতো ভালবাসা ও স্বাধীনতার জন্যই সব গোলমাল বলে গুলিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তিনি মোহিতকে জানান যে, জাঁ জেনের সমস্যার সঙ্গে তাঁদের সমস্যা ভিন্ন। জেনে জন্ম থেকেই নিজেকে পরিত্যক্ত দেখেছেন - কিন্তু তাঁরা পরিত্যক্ত হয়েছেন

অনেক পরে। রাজনীতিতে হাংরিদের সন্দেহ, অবিশ্বাস। রাজনীতি মানুষের মুক্তি আনতে পারে না। এক ধরণের সমাজ ভেঙে তা আরেকধরণের সমাজ গঠন করে, ব্যক্তি সেখানে গৌণ হয়ে যায়। অথচ শৈলেশ্বর সামাজিক তত্ত্বেই বিশ্বাসী নন। তিনি বিশ্বাস করেন ব্যক্তির ভিতরের দিকে তাকানোয়। আত্মার নিঃশৃঙ্খল মুক্তি চান। রাজনীতিকরা রাজনীতির কাজ করেন,কবি লেখকেরা করেন সৃষ্টিশীলতার কাজ। ফলে সমাজের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার ব্যাপারটি থেকে যায়। অশ্লীলতার ধারণাটিকে শৈলেশ্বর গুরুত্ব দেন না। কারণ, তথাকথিত অশ্লীল শব্দের মধ্যেও সামাজিক লক্ষণ নিহিত। সমাজের প্রাকৃত স্তরে অশ্লীল শব্দ দৈনন্দিন বাচনিকতার অন্তর্গত। তাই শৈলেশ্বরের কাছে শ্লীল-অশ্লীল অবান্তর। 'মুক্ত কবিতার ইস্তাহার'-এ তিনি বলেছেন, "সমাজ যে সব শব্দকে অশ্লীল বলে বর্জন করে এবং যে চিন্তাকে দূষণীয় বলে ধিক্কার দেয়, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমসাময়িক জীবনের অনেক সত্য।"[১০২]

'শিল্প ও সত্য' শীর্ষক রচনায় কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে শৈলেশ্বর অনীহা ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত সাহিত্য সম্পর্কে বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তদের ধ্যানধারণা ব্যখ্যা করে, নিজেদের সাহিত্যাদর্শ নির্দেশ করেছেন। কমলকুমারের ভাষা তাঁর কাছে প্রাণহীন কারুকর্ম, শোলার দুর্গা প্রতিমা মাত্র। উনিশ শতকের পর থেকে বাংলাভাষা একঘেঁয়ে ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে বলে তাকে আক্রমন করা উচিত মনে করেছেন। কিন্তু সে আক্রমণই শুধু ভাষাকে বাঁচাবে না। কমলবাবু সেটাই করেছেন। শুধু ভাষাকে আক্রমণ করেছেন; কিন্তু প্রচল জীবনকে আক্রমণ করেননি। শৈলেশ্বর ভাষা ও জীবন দুইকেই আক্রমণ করার কথা বলেন। বিষয় অতিরিক্ত ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। লেখেন,

> কমলবাবু আমাদের আত্মার কেউ নন। তিনি অতীত বিশ্বাস, তিনি শুধু সংস্কারগুলিই নন, কুসংস্কারগুলিও। তাঁর ঈশ্বর জীর্ণ, তাঁর ঈশ্বরের পচা শবের দুর্গন্ধ - আমাদের মুগ্ধ করতে পারেনি। এটা হয়ত আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু যে শবদেহ তিনি গন্ধে, বর্ণে সাজিয়ে চলেছেন তাতে আর একটি কুসুম অর্পন করা আমাদের মতো হতভাগ্য অবিশ্বাসীর পক্ষে অসম্ভব। ... আমার মর অভিজ্ঞতা এ কথা বলে-যাবতীয় ইতিহাস, সমাজ, মূল্যবোধ, রাজনীতি, ধর্ম সবকিছুকে সন্দেহ করতে, অস্বীকার করতে প্ররোচনা পাই আমি - আমি হয়ে পুনরায় ফিরতে চাই আমার

আবিষ্কৃত নিজস্ব সত্যে - সৃষ্টির মূল চেতনার সঙ্গে নিজের চেতনার যোগসূত্র স্থাপিত হলেই আমার উদ্ধার আমি জানি।[১০১]

তাই ভাষাই হোক অথবা জীবন - সেখানে আত্ম-আবিষ্কারই মূল কথা। কমল কুমারের রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, ঈশ্বর, অধ্যাত্মদর্শন শৈলেশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত আদর্শ। শৈলেশ্বর কমলকুমারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের শেষ পংক্তি - 'ফলত কোথাও মায়া রহিয়া গেল' কে পাল্টে লিখতে চান 'ফলত কোথাও বেদনা রহিয়া গেল।' 'কারণ জীবনানন্দই তো বলে গেছেন, - 'বেদনার আমরা সন্তান।'[১০৪]

বিষয় ও ভাষার এই সম্পর্ক ও তুল্যমূল্যতা নিয়ে শৈলেশ্বর বিশেষ সতর্ক ছিলেন। ভাষা চৈতন্যের প্রকাশ বলে ভাষার প্রশ্নটি তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরী মনে হয়েছে। "ভাষার জীবন ও মৃত্যু" শীর্ষক রচনায় ভাষার প্রাসঙ্গিকতা ও শক্তি নিয়ে তিনি কিছু কথা বলেছেন। যেমন, —

> যন্ত্রযুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে ব্যাপকতম টানা পোড়েন, তার ছাপ কবিতার শরীরে থাকবেই, স্খলিত ও গলিত এই সভ্যতার রূপ ও গন্ধ যতই ধরা পড়বে কবির কাছে ততই তার ভাষা হবে খড়্গের মতো ধারালো, নিষ্ঠুর এবং অভিজ্ঞতার আলোআঁধারির খেলা হবে তত বেশী।[১০৫]

শৈলেশ্বর দেখান বুর্জোয়া সভ্যতা, যন্ত্রযুগ, ব্যক্তির অসহায়তা, কুসংস্কার পরাধীনতা একজন কবি বা লেখককে বিভ্রান্ত করে। এক্ষেত্রে তাঁর ভাষায় —

> প্রকৃত স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে হয় এমন ভাষা যার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত মানুষের পরিচয় ছিল না। ... এখানেই গুরুত্বপূর্ণ আর একটি প্রশ্ন এসে পড়ে। ভাষা জিনিসটি কি? খুশীমতো ভাষা তৈরী করা যায় কিনা। ভাষা ইচ্ছামত তৈরী করা যায় না। সমস্ত - জীবন অভিজ্ঞতার সৎ প্রকাশই ভাষা। স্রষ্টার স্বপ্ন কল্পনা ও জীবন দৃষ্টির সম্মিলিত ফল তার ভাষা।[১০৬]

শৈলেশ্বর বলেন যে, এই ভাষাকে অর্জন করতে অসৎ চৈতন্যের পরিধি ভেঙে লেখককে বেরিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ মিথ্যাকে সরিয়ে সত্যের দিকে, মোহকে ছাড়িয়ে বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যেতে হয়। সৎ চৈতন্যের দিকেই রয়েছে ভাষার ঠিকানা। সৎ চৈতন্য বলতে শৈলেশ্বর

প্রতিবাদী চেতনাকে ইঙ্গিত করেন। তিনি মনে করেন, ভাষা যখন বাস্তবতা, প্রতিবাদ ও অস্তিত্বের নগ্ন উদ্ভাসক হয়ে ওঠে তখন তা সংক্রামক হয়ে যায়। এমনকি হয়ে ওঠে অন্তর্ঘাতী। ফলে তা পাঠককেও জাগিয়ে দেয়। এই নিরিখে তিনি জীবনানন্দের ভাষার সজীবতার কথা বলেন। অভিজ্ঞতা কল্পনা, বাস্তবতা, আঘাত ও বেদনা সেখানে একাকার। ঐ ভাষা জীবনের প্রতীক স্বরূপ। পক্ষান্তরে, উৎপল কুমার বসুর ভাষাকে বলেন শব্দ ও ছন্দের মিথ্যা মায়াজাল, মিষ্টিক। বলেন, ভাষার অপমৃত্যু ঘটেছে সেখানে। কবিতা যে মনোরঞ্জনের জিনিস নয় এ কথা দিয়ে 'প্রতিবাদের সাহিত্য' রচনাটি শুরু করেছেন শৈলেশ্বর। বাংলা ভাষায় জনচিত্তজয়ী প্রচুর কবিতা ও গদ্য লেখা হচ্ছে। পাঠকরা তা কিনেও পড়ছেন। এ জন্য কবি লেখক এবং পাঠকদেরও শৈলেশ্বর আক্রমণ করেছেন। লেখকদের 'ব্যবসায়ী', পাঠকদের 'রোবট' বলে নিন্দামন্দ করেছেন। সমাজকেও 'মস্তিষ্কহীন' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর প্রতিবাদী লেখাগুলির জন্যে। তবে রবীন্দ্রনাথে ঔপনিষদিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। উপরন্তু শৈলেশ্বরের অভিযোগ এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ জীবনের কোনো মূল বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছায় না বলে দুর্বল। অথচ জীবনানন্দের প্রতিবাদ জীবনের অন্তস্থল পর্যন্ত পৌঁছায় বলে তা সার্থক। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদগুলো জীবনের শেষ পর্বে আর জীবনানন্দ সারা জীবনভরই প্রতিবাদী। জীবনানন্দের প্রতিবাদ আলাদা করে বিষয় ভিত্তিক নয়, তিনি জীবনের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ভাবেই প্রতিবাদী। প্রতিবাদী কবি হিসেবে জীবনানন্দ ছাড়াও বিদেশের র‍্যাঁবো, লুই ফর্দিনান্দ, আর্তো এবং জাঁ জেনের নাম করেছেন তিনি। তবে রাজনৈতিক বা বামপন্থী কবিদের তিনি প্রতিবাদী বলতে চান নি। শৈলেশ্বর বলেছেন "শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা পৃথিবীতেই প্রতিবাদী সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য।"[১০৭] তাঁর আশা ও সংকল্প জানায় - "এই প্রতিবাদী অন্তর্ঘাতীর সংখ্যা যতই বাড়বে ততই সাহিত্য ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্ত্ব ভোগীদের পরমায়ু সংক্ষিপ্ত হতে থাকবে। আমাদের সামনে এখন এই কাজ।"[১০৮] বলেন,

> আমরা কালো সাহিত্যের পক্ষপাতী। সেই সাহিত্য জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সম্ভাবনাগুলি মুক্ত করে দেবে - কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ও সম্ভাবনামূলক সৃষ্টি যদি কালো হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তবে সে জন্যে সাহিত্যকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই - জীবনই এ জন্যে দায়ী, জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি এই তমসা লুকিয়ে নেই? এই অন্ধকারই সচেতন বাস্তবতার প্রতিটি ঘটনার পেছনে সক্রিয় শক্তি - তাই এই সামগ্রিক জটিলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মধ্যেই

কবির অস্তিত্বের মূল্য প্রতিপন্ন হয়।[১৬]

সুতরাং প্রতিবাদ এখানে কোনো আরোপিত ব্যাপার নয়। তা কবির সত্তা ও স্বভাবের সঙ্গে ওতপ্রোত। বাস্তবতা ও অস্তিত্বের সমার্থক।

লেখকের শ্রেণীগত অবস্থান নিয়েও শৈলেশ্বর আলোচনা করেছেন। লেখক কেন লিখবেন, কাদের জন্যে লিখবেন, কার কথা লিখবেন? যদি লেখক নিজের কথাও লেখেন তবে প্রশ্ন উঠবে তিনি কে? কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি? এটাও সত্য যে, যে সমাজে লেখক জন্মাবেন, সেই সমাজের মূল্যবোধ দ্বারাই অনেকখানি তিনি চালিত হবেন. তথাপি লেখককে বিদ্রোহী হতেই হবে। এই বিদ্রোহ কখনই রাজনীতিকদের মতো হতে পারে না। যেহেতু একজন লেখক সমাজ ও সভ্যতাকে সরাসরি পাল্টাতে পারেন না. এই সমস্ত কথা নিয়ে 'চরিত্রহীনতার আয়োজন' লেখাটি শুরু করেছেন শৈলেশ্বর। তাঁর মনে হয়েছে, আপন উত্তরাধিকারকে বিশ্লেষণ করেই লেখক গড়ে উঠবেন। লেখক হবার পর, একজন মানুষ শ্রেণীহীন হয়ে যাবেন। তখন তিনি শুধুই নিজের কথা বলবেন, আত্মানুসন্ধান চলাবেন, ভবিষ্যতের আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন। কারণ যেটি লেখক শ্রেণীহীন, তার কোনো শ্রেণী থাকতে পারে না। যথার্থ লেখক সমাজহীন, চরিত্রহীন, শ্রেণীহীন - কেবল আপন প্রকৃতি ও সত্তার ভাঙন ও নির্মাণে ব্যস্ত —

> সর্বহারা একটি শ্রেণী কিন্তু আমি একজন সর্বহারা হয়েও যে মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠলাম - নিজেকে খুঁজতে শুরু করলাম, আমি হতে চাইলাম, সেই মুহূর্তে আর সর্বহারা থাকছি না, কারণ আমি শৃঙ্খলকে খুলে ফেলেছি, শোষণের কালো হাত গুঁড়িয়ে দিতে চাইছি, আমি অন্য দ্বারা চালিত নই বলেই সর্বহারা নই, স্বচালিত। আত্মশক্তি সম্বন্ধে এই নবজন্ম আমাকে শ্রেণীশূন্য করে ফেলে, কিন্তু শ্রেণীশূন্য হয়ে আমার কাজ হয়, তখন সমস্ত সর্বহারাকেই এই অঙ্গীকারে প্ররোচনা দেওয়া।[১৭]

এখানে শৈলেশ্বর লেখককে শ্রেণীহীন এক আত্ম অন্বেষণকারী অভিযাত্রিক হিসেবে দেখতে চান। 'কেন লেখা' শীর্ষক রচনায় শৈলেশ্বর জানান যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতিবাদ করাই লেখার মূল কারণ। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্যক্তির স্বাধীনতাস্পৃহাকে প্রকাশ করবার জন্যই লেখা দাসত্বের বিরোধিতার জন্যই সাহিত্যকর্ম প্রয়োজন।

> নামহীন দাসত্বের শেষ পর্যায়ে এসে কবি শিল্পী তার কর্তব্য ঠিক করে নিচ্ছে অন্তর্ঘাতী ছাড়া কবির আজ কোনো নাম নেই - জীবন বিপ্লবী ছাড়া অন্য কোনো রোলে কবিকে আর চেনা যায় না। মানুষ এখনও সত্যভাষী হয়ে উঠতে পারে নি, বুর্জোয়ার মূল্যবোধ তাকে তার হৃদয়ের কবাট রুদ্ধ করে রাখতে বাধ্য করেছে ... কবি এই জন্যেই বেঁচে আছে ও সংগ্রাম করছে যে একদিন সব মানুষই তার মত হৃদয় খুলে দেখাবে, কারণ হৃদয়ই পরম সত্যের উৎসারণ স্থল। কবি নিজের জন্য নয়, লেখে সে জীবনের জন্যে, সে জন্য জ্ঞান ও চৈতন্যে সমগ্র মানবমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হওয়া ছাড়া তার সার্থকতা নাই।[১১১]

লেখকের একক ব্যক্তিত্ব সমাজের ব্যক্তিসমষ্টির দায় বহন করে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়, তাদেরকে নিজের যাত্রাপথের সঙ্গী করে নেয়। শৈলেশ্বরের 'কবিতার অভিযাত্রা' শীর্ষক রচনাটি পূর্বোক্ত রচনা দুটিরই প্রতিপাদ্যকে সংহত করেছে। বুর্জোয়া সভ্যতা ও প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা, নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চেতনার আবিষ্কার ও সম্প্রসারণ, মৃতপ্রায় ভাষার মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি জাগিয়ে তোলা, মিথ্যা ও অসঙ্গতিগুলোকে আক্রমণ করে যথার্থ জীবন সত্যকে রূপায়িত করা একজন যথার্থ কবির কাজ হওয়া উচিত। একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কবি ও কবিতাকে এক অনির্দ্দেশ্যতার দিকে যাত্রা করতে হবে। সেই নির্দিষ্ট বিন্দুটি কী? শৈলেশ্বর বলেছেন, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। আবার "জীবনের নৈরাজ্যকে আক্রমণ করতে হলে কবিকেও নিতে হয় এক নৈরাজ্যের পথ।"[১১২] কিংবা —

> অপরাধী সভ্যতার মধ্যেই কবির জন্ম। এখানকার বিষাক্ত হাওয়ায় তার শ্বাসগ্রহণ। ... কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই গলা টিপে ধরা হবে। তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ আছে - প্রতিবাদ দিয়েই জীবনের মধ্যে প্রতিবাদ করবে কবি।[১১৩]

কবির অবস্থান এই সমাজে —

> খুনীর মতো। গণিকার মতো। সন্তের মতো। গরল পান করা ছাড়া তার গত্যন্তর নাই। ... জীবনের খণ্ড টুকরোগুলি বয়ে বেড়াতে হয় আমাদের - সেই খণ্ডগুলিই যন্ত্রণা আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পাবে - কবিই তাকে পূর্ণতা দেবে।[১১৪]

অর্থাৎ কবি একদিকে ভুক্ত ভোগী, অন্যদিকে সক্রিয়, একদিকে সে অপরাধ জগতের বাসিন্দা অন্যদিকে অপরাধ উত্তীর্ণ এক প্রোজ্জ্বল সত্তা। জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে, উপলব্ধির প্রকাশে অনন্য। অন্ধকার ও পঙ্কিলতা থেকে জ্ঞানালোকের পথে অভিযাত্রী। শৈলেশ্বর বলেন —

> জীবনের মূল সত্যগুলির উৎসর দিকে কবি যেতে শুরু করে - আসে বাধা, প্রতি আক্রমণ করতে হয় কবিকে। বাংলা কবিতায় এই উৎস সন্ধান শুরু হয়েছে। কবিকে এটা বুঝে নিতেই হয় যে, অপরাধ করার প্রবণতা মানুষের মধ্যেই আছে। আবার তারই মধ্যে আছে অপরাধ থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা। আধুনিক বাংলা কবিতা মানুষের অন্তর জগতের এই নূতন উন্মোচন নিয়ে এগিয়ে আসছে - এবং এগিয়ে যাবে মনে হয়।[১১৫]

'জীবন প্রতিষ্ঠান' ও 'আমাদের অভিজ্ঞতা' হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যার প্রয়াস। 'মুক্ত কবিতার ইস্তাহার' শীর্ষক রচনায় বর্ণিত সূত্র গুলিকেই কম বেশী এ 'দুটি ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে। হাজার বছরের এই নষ্ট সমাজে তাঁদের আবির্ভাব কেন, ঐ আবির্ভাবের সার্থকতা কী তারই ব্যাখ্যা রয়েছে প্রবন্ধ দুটিতে। যেমন, "ভারতবর্ষে সমাজ প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করে হাংরি জেনারেশন। প্রতিষ্ঠান প্রবল চেষ্টা করেও একে দমন করতে পারে নি।"[১১৬] কিংবা "মহান সাহিত্য - আমরা বিশ্বাস করি না ... আমরা মনে করি, যে সাহিত্য জীবনের আগুনকে ধারণ করে সেই সত্য-সাহিত্য। আমরা চেয়েছি সাহিত্যের ভাষা হবে তাই যা বুর্জোয়াকে ভায়োলেট করবে, প্রাতিষ্ঠানিক, জড় বোধবুদ্ধিকে আক্রমণ করবে।"[১১৭] কিংবা "সাহিত্য ও জীবনকে আমরা এক করতে চেয়েছি। জীবনযাপনের অভিজ্ঞতাই হবে সাহিত্য।"[১১৮] কিংবা "শোষণ ও মিথ্যা থেকে নিজেদের মুক্ত করাই ছিল হাংরিদের লক্ষ। হাংরি সাহিত্য তাই আর কোনো শিল্প নয়, হাংরি সাহিত্য জীবন অভিজ্ঞতার মুক্তি, হাংরি সাহিত্য যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, তার ফলে মানুষের ভুলে যাওয়া সত্য গুলি সেই সাহিত্যে উঠে এসেছে। .... বুর্জোয়ার সাহিত্য শিল্প ধর্ম, মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করার এক একটা সোনার শিকল। হাংরি স্পিরিট কোনোরকম পরাধীনতা মেনে নেয় না। স্বাধীনতার এই নতুন চেতনা থেকেই ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরু।"[১১৯]

'প্রেত প্রতিরোধ' ও 'নিজের আবিষ্কৃত সত্য' রচনায় নিজেদের প্রসঙ্গ এলেও পূর্বসূরী কয়েক জন বাঙালী কবি ও শিল্পীর কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋত্বিক ঘটকের আত্মঘাতী মৃত্যুর পটভূমিকা তাঁদেরই শিল্পকৃতি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন 'প্রেত প্রতিরোধ' নিবন্ধে। বলতে চেয়েছেন, সমাজের একটা ব্যবস্থাই তাঁদের ঘাতক। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানই তাঁদের মৃত্যুকে টেনে আনতে বাধ্য করেছে। শৈলেশ্বর বলেছেন, "মানুষ যখন আর তার জীবনের রূপান্তর ঘটাতে পারে না তখনই মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেয়।"[১২০]। উক্ত তিন বাঙালী স্রষ্টারও জীবনের ভিন্ন রূপান্তর আটকে গিয়েছিল বা আটকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর প্রতিবাদও করে গিয়েছেন তাঁরা তাঁদের সাহিত্য কর্মের মধ্যে। জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা থেকে পংক্তি তুলে ধরছেন শৈলেশ্বর, 'অশ্বত্থের শাখা করে নি প্রতিবাদ'? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' থেকে দেখিয়েছেন যে, হারুর মৃত্যু তার সহজ জীবনের মতই সহজ ও প্রাকৃতিক। অথচ শরীর অর্থহীন জীবনই আরেক মৃত্যুর সূচক - যেমন জটিল তাঁর জীবন, প্রেম; তেমনই মৃত্যুর ইশারা। ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' ছবির উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, নায়ক নিজের বোনকে বেশ্যা হিসেবে আবিষ্কার করে জীবনের কী ভয়ংকর ঘাতক বৃত্তিকে অনুভব করেছেন — "সুবর্ণ রেখার জলে যে জীবন ভেসে গেল, আত্মহত্যা করলেও তা তো ফিরবেনা, ফেরে না। জীবনের অপঘাতগুলি শেষ পর্যন্ত অপঘাতেই থেকে যায়।"[১২১] শৈলেশ্বর বলেছেন, " ... জীবনানন্দ এবং মানিক যে ক্ষুধা নিয়ে জীবনকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছিল তা সত্যের ক্ষুধা।"[১২২] আর ঋত্বিক "চলচ্চিত্র মাধ্যমকে নিয়ে সত্যের কাছে যেতে চেয়েছিল বলেই - সে জীবনবিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা নিহত হল।"[১২৩] 'নিজের আবিষ্কৃত সত্য' প্রবন্ধটি ঋত্বিক ঘটকের আত্মত্যাগ ও অবদান নিয়ে আলোচনা। ঋত্বিককে প্রাবন্ধিক একজন বিপ্লবী হিসেবে দেখেছেন। বুর্জোয়া শিল্পের বিরুদ্ধাচরণ করে জীবন ও সত্যের জন্য বিদ্রোহী ঋত্বিকের মৃত্যু শৈলেশ্বরদের সৃজনশীলতার কাছে উদ্দীপক ঠেকেছে। তিনি লিখেছেন, "ঋত্বিকের মধ্যে আমরা সেই শক্তি দেখেছি, যে শক্তি একজন প্রকৃত বিপ্লবীর, যে শক্তির বলে সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করেও একজন প্রতিবাদ করে - মৃত্যুও যখন একটা অস্ত্যর্থক মূল্যবোধে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।'[১২৪] ঋত্বিকের মৃত্যুর কারণ যে প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নতুন সংকল্প দিয়ে শৈলেশ্বর বক্তব্য শেষ করেন।

তথ্যসূত্র

১. মলয় রায়চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ - ৪।

২. মলয় রায়চৌধুরী, (হাংরি আন্দোলন ঃ পিছন ফিরে দেখা), জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ - ৫৭।

৩. উত্তম দাশ, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ১৪৪।

৪. মলয় রায় চৌধুরী, কবিতীর্থ পত্রিকা গ্রীষ্ম বর্ষা সংখ্যা ১৪১০, কলকাতা, পৃঃ ১৩।

৫. মলয় রায় চৌধুরী, জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৯২, পৃ ৫৮।

৬. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ঃ ১৪।

৭. তদেব পৃঃ ১৬।

৮. তদেব পৃঃ ১৪।

৯. মলয় রায় চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ - ৬।

১০. (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থসমালোচনা দ্রষ্টব্য) - শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ১৪।

১১. মলয় রায় চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা, ১৯৮৫,, পৃ - ৫।

১২. মলয় রায়চৌধুরী, জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ - ৫৭।

১৩. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৫ পৃ ঃ ২৬।

১৪. তদেব পৃ ঃ ৩৬।

১৫. প্রদীপ চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী রচনা সংকলন, প্রকাশক লেখক স্বয়ং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ ১১।

১৬. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ - ৩-৫।

১৭. তদেব, পৃ - ৭।

১৮. মলয় রায়চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ - ৫।

১৯. মলয় রায় চৌধরী, কবিতীর্থ পত্রিকা, গ্রীষ্মবর্ষা সংখ্যা, ১৪১০, কলকাতা, পৃ ১৫-১৬।

২০. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ - ১৪।

২১. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ - ৭।

২২. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ - ২৬।

২৩. তদেব পৃ - ১৪।

২৪. মলয় রায় চৌধুরী, কৃত্তিবাস থেকে হাংরি আন্দোলন ঃ বাংলা কলতার পালাবাদল, কবিতীর্থ পত্রিকা, গ্রীষ্ম বর্ষা সংখ্যা, ১৪১০, কলকাতা পৃ ঃ ১৫।

২৫. উত্তম দাশ, হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ২০০২, পৃ - ১৪৪।

২৬. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫।

২৭. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ - ১৩।

২৮. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ, কৃত্তিবাস, কলকাতা, ২০০৩, পৃ - ২৩।

২৯. মলয় রায় চৌধুরী, (হাংরি আন্দোলন, পিছন ফিরে দেখা) জিজ্ঞাসা সংকলন ১৯৯২, কলকাতা, পৃঃ ৬৩।

৩০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস সংকলন ২, প্যাপিরাস কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ - ১১২।

৩১. তদেব, ভূমিকাংশ, - পৃ ঃ ৫৬।

৩২. অমিতাভ চৌধুরী, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ, কৃত্তিবাস, কলকাতা ২০০৩, পৃ ঃ ১০৬।

৩৩. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি, অ্যাংরি বিট ঃ প্রতিসন্দর্ভের বৈভিন্ন্য, অমৃত লোক পত্রিকা ৯৯ সংখ্যা, মেদিনীপুর, ২০০৩, পৃঃ ৮২।

৩৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ ৩৫।

৩৫. মলয় রায়চৌধুরী, মৃত্যুমেধী শাস্ত্র ঃ প্রথম ইন্সটলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন, মলয় রায় চৌধুরী, পাটনা, ১৯৬৫, পৃ ঃ ১।

৩৬. তদেব পৃ ঃ ১।

৩৭. তদেব পৃ ঃ ২।

৩৮. তদেব পৃ ঃ ২।

৩৯. তদেব পৃ ঃ ৩।

৪০. তদেব পৃ ঃ ২-৩।

৪১. তদেব পৃ ঃ ৩।

৪২. তদেব পৃ ঃ ৩।

৪৩. তদেব পৃ ঃ ৩,৪

৪৪. তদেব পৃ ঃ ৪।

৪৫. তদেব পৃ ঃ ৪।

৪৬. তদেব পৃ ঃ ৫।

৪৭. তদেব পৃ ঃ ৫।

৪৮. তদেব পৃ ঃ ৬।

৪৯. তদেব পৃ ঃ ৬-৭।

৫০. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ ঃ ৩৬।

৫১. মলয় রায় চৌধুরী, মৃত্যুমেধীশাস্ত্র ঃ প্রথম ইনস্টলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন, মলয় রায় চৌধুরী, পাটনা, ১৯৬৫, পৃ ঃ ৮।

৫২. তদেব পৃ ঃ ৯।

৫৩. তদেব পৃ ঃ ১০।

৫৪. তদেব পৃ ঃ ১২।

৫৫. Bernard Oliver, Rimband: Collected Poems, Pengin Books, England 1997 Page 8, 13.

৫৬. মলয় রায়চৌধুরী, মৃত্যু মেধীশাস্ত্র ঃ প্রথম ইন্সটলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন, মলয় রায়চৌধুরী, পাটনা, ১৯৬৫ পৃ ঃ ১২।

৫৭. তদেব পৃ ঃ ১৩।

৫৮. তদেব পৃ ঃ ১৩।

৫৯. তদেব পৃ ঃ ১৪।

৬০. তদেব পৃ ঃ ১৬।

৬১. তদেব পৃ ঃ ১৮।

৬২. তদেব পৃ ঃ ১৯।

৬৩. তদেব পৃ ঃ ১৯।

৬৪. তদেব পৃ ঃ ১৯।

৬৫. তদেব পৃ ঃ ২১-২২।

৬৬. তদেব পৃ ঃ ২৪।

৬৭. তদেব পৃ ঃ ২৬।

৬৮. মলয় রায় চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ ঃ ১৮।

৬৯. তদেব পৃ ঃ ৮।

৭০. তদেব পৃ ঃ ১০।

৭১. তদেব পৃ ঃ ১০।

৭২. তদেব পৃ ঃ ২৯।

৭৩. তদেব পৃ ঃ ৩০।

৭৪. তদেব পৃ ঃ ৩১-৩২।

৭৫. তদেব পৃ ঃ ৩৩।

৭৬. তদেব পৃ ঃ ৩৯।

৭৭. তদেব পৃ ঃ ৪৫।

৭৮. তদেব পৃ ঃ ৪৭।

৭৯. তদেব পৃ ঃ ৪৭।

৮০. তদেব পৃ ঃ ৪৮।

৮১. তদেব পৃ ঃ ৪৮।

৮২. তদেব পৃ ঃ ৫১।

৮৩. তদেব পৃ ঃ ৫২।

৮৪. তদেব পৃ ঃ ৫৩।

৮৫. প্রদীপ চৌধুরী, ফুঃ পত্রিকা. ৫৯ সংকলন, কলকাতা, ১৯৬৮।

৮৬. শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র পাবলিকেশন, শিলিগুড়ি ১৯৮৪,পৃ - ৩।

৮৭. তদেব পৃ ঃ ৫।

৮৮. তদেব পৃ ঃ ৭।

৮৯. তদেব পৃ ঃ ৭।

৯০. তদেব পৃ ঃ ৭।

৯১. তদেব পৃ ঃ ৭-৮।

৯২. তদেব পৃ ঃ ৯।

৯৩. তদেব পৃ ঃ ১২।

৯৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র পাবলিকেশন শিলিগুড়ি, ১৯৮৪, পৃ ১৪।

৯৫. তদেব পৃ ঃ ১৫।

৯৬. তদেব পৃ ঃ ১৫।

৯৭. তদেব পৃ ঃ ১৭।

৯৮. তদেব পৃ ঃ ১৯।

৯৯. তদেব পৃ ঃ ২২।

১০০. তদেব পৃ ঃ ২৮।

১০১. তদেব পৃ ঃ ২৯।

১০২. তদেব পৃ ঃ ০১।

১০৩. তদেব পৃ ঃ ৩৭।

১০৪. তদেব পৃ ঃ ৪১।

১০৫. তদেব পৃ ঃ ৪৫।

১০৬. তদেব পৃ ঃ ৪৮।

১০৭. তদেব পৃ ঃ ৫৮।

১০৮. তদেব পৃ ঃ ৫৮।

১০৯. তদেব পৃ ঃ ৫৭।

১১০. তদেব পৃ ঃ ৪৩।

১১১. তদেব পৃ ঃ ৬০।

১১২. তদেব পৃ ঃ ৬৩।

১১৩. তদেব পৃ ঃ ৬৪।

১১৪. তদেব পৃ ঃ ৬৫।

১১৫. তদেব পৃ ঃ ৬৬।

১১৭. তদেব পৃ ঃ ৯৪।

১১৮. তদেব পৃ ঃ ৯৪।

১১৯. তদেব পৃ ঃ ৯৫।

১২০. তদেব পৃ ঃ ৬৭।

১২১. তদেব পৃ ঃ ৬৯।

১২২. তদেব পৃ ঃ ৭০।

১২৩. তদেব পৃ ঃ ৭০।

১২৪. তদেব পৃ ঃ ৮৮।

চতুর্থ অধ্যায়

আন্দোলনের বিস্তার পর্ব

১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন বিস্তার পেতে শুরু করে। একাধিক তরুণ ক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি এসে জোটবদ্ধ হতে শুরু করেন। এমনকি কাব্য ও সাহিত্য ভাবনার দিক থেকেও একটা সমধর্মিতা স্পষ্ট হতে শুরু করে। এই গুণটি বাংলা সাহিত্যের আর কোনো পত্রিকাই ধারণ করতে পারেনি। ১৯৬৩ সালে আন্দোলনের বিস্তার কিভাবে হয়েছিল তা মলয় রায় চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ ও বাসুদেব দাশগুপ্তের লেখা থেকেই বিন্যস্ত করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে মতানৈক্য ও ভিন্ন দাবীপত্তন থাকলেও তা থেকে তৃতীয়পক্ষের ইতিহাস বিচারে অসুবিধা হয় না।

মলয়ের লেখা থেকে দেখা যায়, তিনি নিজে তাঁর সতীর্থদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে নিবদ্ধ। তাঁর বয়ান ঃ

> "১৯৬৩ সনে হাতে এল সদ্য প্রকাশিত সেমিলি ম্যাকওয়ার্থের লেখা একটা বই, 'গীয়ম অ্যাপলিনার অ্যাণ্ড দ্য কিউবিষ্ট লাইফ।' চৌরঙ্গীর ফুটপাতে বিদেশী বইয়ের দোকানটায় বইটাকে দেখতেই কিনে ফেলি। সুবিমলের আপিসের ছাদে বসে পড়ে ফেলি বইটা সারাদিনে। গীয়মের চরিত্র আর কার্যকলাপে অবাক হই। যদিও ওঁর কবিতা তেমন চেপে ধরতে পারে না। ... ফাল্গুনি রায় আর ত্রিদিব মিত্রকে পড়ালুম। সুবিমল বসাক পড়তে চাইল না। ও বললে বাংলাভাষায় গদ্যে বিশেষ কাজ হয়নি, গদ্যে অনেক কিছু করার আছে।"[১]

বিভিন্ন নামকরা ব্যক্তিকে মুখোশ পাঠানোর ব্যাপারটা এই বই পড়ার পর মলয়দের কাছে অসাহিত্যিক কাজ বলে মনে হয় নি। এই ১৯৬৩ সালেই প্রদীপ চৌধুরী 'স্বকাল' পত্রিকার নাম পাল্টে রাখেন 'ফুঃ'। কারণ 'স্বকাল' - এর সহযোগী সম্পাদক ঐ বছর 'শ্রুতি' নামে আর একটি পত্রিকা বার করে বেরিয়ে যান। প্রদীপের সঙ্গে মলয়ের আলাপ হল। তিনি পরিচয় করতে যান শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে। কারণ ১৯৬৩ সালে 'এষণা' পত্রিকাতেই শৈলেশ্বরের "ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা" বার হয়ে গেছে। সেই কবিতা মলয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মলয় বলেছেন, 'ঠিকানা দেখে খুঁজে বের করি। টালা ট্যাঙ্কের কাছে একটা দোতলা বাড়ি।[২]" ঐ বাড়িরই একতলায় রাস্তার ধারের একটি অপরিসর ঘরে তখন থাকতেন শৈলেশ্বর ঘোষ ও সুভাষ ঘোষ। মলয় বলেন,

> জানতে পারলুম সুভাষ গদ্য লেখেন। সুভাষ কোনও লেখা দেখালেন না। শৈলেশ্বর বললেন তিনি দেবী রায়কে একটা কবিতা দিয়েছেন। ..... হাংরি বুলেটিনে লেখা আরম্ভ করতেই শৈলেশ্বর আর সুভাষের বাড়িওয়ালাকে বেনামী চিঠি দিয়ে ওদের সম্পর্কে আবোল তাবোল খবর যোগানো হতে থাকে। শেষে ঐ বাসা ছেড়ে ওরা মধ্য কলকাতার একটা মেসে উঠে যায়। মেসে যাবার ফলে আমাদের একটা আড্ডার জায়গা হয়।[৩]

ত্রিদিব মিত্র থাকতেন হাওড়ায়। তিনি তো হাংরি আন্দোলনে সামিল হয়েই ছিলেন। তাঁর বাড়িতে থাকতেন বিষ্ণুপুরের এক তরুণ সুবো আচার্য, তিনিও এঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। যুক্ত হলেন বিষ্ণুপুরের আরেক যুবক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং ফাল্গুনী রায়। ১৯৬৩ সালে আরও যাঁরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন রবীন্দ্র গুহ, শংকর সেন, অরূপরতন বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, অমিত সেন, অমৃত তনয় গুপ্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ভানু চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভৌমিক, শম্ভু রক্ষিত, তপন দাস, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, সুব্রত চক্রবর্তী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, মিহির পাল, অরণি বসু, অজিতকুমার ভৌমিক প্রমুখ। শৈলেশ্বর ঘোষও বলেন '১৯৬৩ তে আমরা সংগঠিত হয়েছিলাম।'[৪] লেখেন,

> ১৯৬৩ ঃ হাংরি জেনারেশনের সংগঠন ও সৃষ্টি ঃ পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আমাদের বন্ধু সতীন্দ্র ভৌমিক দমদমের বস্তিতে থাকত ... অফিস ফেরৎ সতীন্দ্র চলে আসত কলেজ ষ্ট্রীট কিংবা ১৬বি শ্যামাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীটে। একদিন যোগাড় করে নিয়ে এল মলয় রায়চৌধুরীর একটা গদ্য।[৫]

এই গদ্য হচ্ছে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রথম ইস্তাহারটি। শৈলেশ্বর বলেন,

> 'এষণা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল সতীন্দ্র। কাগজের একটি সংখ্যায় নাক উঁচু আধুনিকতার ভান করা কবি লেখকদের আক্রমণ করে বসে। সঙ্গে সঙ্গে কফি হাউসের একটা অংশের কাছে ও অপ্রিয় হয়ে যায়। এদিকে ১৯৬৩র প্রথম দিকে 'এষণা' পত্রিকায় ছাপা হয়ে বের হয় আমার 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' সিরিজের বেশ খানিকটা।

> এর পরবর্তী অংশের কিছুটা হাংরি জেনারেশনের ফালি কাগজে কিছুদিন বাদে বার হয়। .... এই কবিতা পঞ্চাশের প্রতিষ্ঠিত কবিদের কারও কারও মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ... এই কবিতা সূত্রেই যোগাযোগ তৈরী হয় উৎপল কুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। .... ৬৩ সাল পর্যন্ত শক্তিই ছিলেন তখনকার সেই হাংরি জেনারেশনের সব কিছু।... এই কবিতাসূত্রেই (শৈলেশ্বরের 'তিন বিধবা' যা হাংরি জেনারেশনের লিফলেটে প্রকাশি হয়েছিল) কফি হাউসে একদিন যোগাযোগ হয়ে যায় প্রদীপ চৌধুরী এবং সুবো আচার্যের সঙ্গে। ... 'তিন বিধবা' কবিতা ছাপা হবার পর আমি মলয় রায় চৌধুরীর চিঠি পাই। এই প্রথম মলয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ।[৬]

লক্ষণীয়, এই ১৯৬৩ সালেই পঞ্চাশের ক'জন স্বনামী ব্যক্তিত্ব এই আন্দোলন থেকে নিজেদের পৃথক করে নেন। বিশেষত শক্তি চট্টোপাধ্যায়। মলয় লিখেছেন, "শক্তি বিনয় সন্দীপন সিরাজ ১৯৬৩ সনেই আন্দোলন থেকে নিজেদের আলাদা করে তো নিয়েইছিলেন, হাংরি আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখা আরম্ভ করেন স্বনামে বেনামে।"[৭] শৈলেশ্বরের ভাষায় "শক্তির সেই হাংরি জেনারেশন, যার সঙ্গে সন্দীপন, উৎপল এবং মলয়ের নাম যুক্ত ছিল, বন্ধ হয়ে যায়।"[৮] বাসুদেব দাশগুপ্ত বলেন, "১৯৬৩ সালে হাংরি আন্দোলন থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজেকে গুটিয়ে নিলে নব পর্যায়ে হাংরি আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৬বি শ্যামাচরণ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীটের ঐ ঘরখানাকে কেন্দ্র করেই।"[৯] মোট কথা, শক্তির প্রবেশ ও প্রস্থান হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব পায়নি। শৈলেশ্বর বলেছেন, 'হাংরি জেনারেশন শক্তির কাছে কোন সিরিয়াস ব্যাপার ছিল না, ওটা ছিল নিজেকে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করার একটা চালাকি মাত্র।'[১০] একই মত মলয়েরও। আসলে হাংরি আন্দোলনের মাধ্যমে যে ব্রেক থ্রু তিনি চাইছিলেন তা পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর হাংরি আন্দোলন তাঁর ঘাড়ের ভূত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[১১] শক্তি, সন্দীপনের প্রস্থানের পরেও হাংরি আন্দোলন ফলবন্ত হয়ে এই সাধারণ সত্যটিই প্রমাণিত করেছিল যে, যৌথ আন্দোলন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির ভূমিকা গৌণ। তা তিনি যত বড় ব্যক্তিই হোন না কেন। এটা হাংরি আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালেও প্রমাণিত হয়েছে, যখন ১৯৬৫ সালে মলয় রায় চৌধুরীও আন্দোলনকে মৃত ঘোষণা করে সরে যান। কারণ তার পরেও এ আন্দোলন বহুদিন পর্যন্ত সজীব ছিল।

যাই হোক, সালটিকে হাংরি আন্দোলনের তুঙ্গ বিন্দু বলা যায়। বাসুদেব যাকে বলেছেন, 'নব পর্যায়ে হাংরি আন্দোলন।'[১২] শৈলেশ্বর জানিয়েছেন, ১৯৬৪'র মার্চ এপ্রিলে মলয় প্রথম

শৈলেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। শৈলেশ্বর বলেন, "যা হোক, ১৯৬৪তে ঠিক হল যে, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুরু করা হবে। মলয়কে গ্রহণ করা হয়। ... সুবিমল বসাকও হাংরি জেনারেশনে যোগ দেয় সেই সময়।'[১৩] এ সব থেকে বোঝা যায়, পুরনো পর্বের হাংরি আন্দোলনকে শৈলেশ্বর, বাসুদেবরা মূল্য দিতে চাইছেন না। 'হাংরি জেনারেশনের অস্পষ্ট সূচনা বলে তাকে নেপথ্যে রাখতে চাইছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তা ঠিক নয়। আন্দোলনের কার্যকারণ সূত্রের নিয়ামক হিসেবে কোনো পর্বকেই তুচ্ছ করে দেখা চলে না। আমাদের মনে হয়, এখানে দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে যতটা না - তার চেয়ে বেশী ব্যক্তিগত তিক্ততার জেরে শৈলেশ্বর মলয় দু'জনেই পারস্পরিক বিরোধিতা করেছেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে ১৯৬২ সালকেই হাংরি জেনারেশনের সূত্রপাতের বছর ধরতে হবে - ১৯৬১ নয়, ১৯৬৩ ও নয়। মলয়ের মগজ থেকেই 'হাংরি জেনারেশন' শব্দবন্ধটি যে উদ্ভাসিত তা ঐ লিফলেটগুলি ছাড়াও, মলয়ের লব্জ প্রয়োগই নিশ্চিত করে। তাই বলে মলয়কে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের স্রষ্টাও বলা চলে না। আন্দোলন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় - যে অর্থে হাংরি জেনারেশন একটি আন্দোলন সে অর্থে নয়। 'সবুজ পত্র' কে যদি আন্দোলন বলি সেক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী স্রষ্টা। আজ অবশ্য তাতেও সন্দেহ! "সবুজ পত্র, ছিল এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মুখপত্র। এটা তাঁরই আইডিয়া। সম্পাদক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী তাঁরই দ্বারা মনোনীত।"[১৪] 'কল্লোল' কিন্তু কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, 'কবিতা' অবশ্য একক বুদ্ধদেব বসুরই। যাই হোক, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন একটি যূথবদ্ধতার সৃষ্টি। সেখানে, মলয়, শৈলেশ্বর, প্রদীপ, সুবিমল, বাসুদেব, সুভাষ প্রভৃতি সকলেরই সমবেত অবদান রয়েছে।

হাংরি আন্দোলনের বিস্তার ও তীব্রতায় ১৯৬৪ সালের গুরুত্ব সর্বাধিক। লক্ষণীয়, হাংরি সাহিত্যের বিচিত্র শাখার উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি গ্রন্থ এ বছরেই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, প্রদীপ চৌধুরীর, 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি' কাব্যগ্রন্থ, মলয় রায় চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ 'শয়তানের মুখ', প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন ও মৃত্যু মেধী শাস্ত্র', নাটক 'হিবাকুষা' প্রভৃতি। বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রতনপুর' গল্পটিও ঐ বছরেই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বোপরি, এ বছরই বেরোয় সেই বিখ্যাত এক ফর্মার হাংরি বুলেটিন যার জন্যে লেখকদের উপর পুলিশী অভিযান চলে। এই সংখ্যার প্রকাশক ছিলেন সমীর রায় চৌধুরী। পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল 'হাংরি জেনারেশন।' তাতে লেখক ছিলেন, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায়, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, শৈলেশ্বর ঘোষ, উৎপলকুমার বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায় চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ। প্রত্যেকটি নামের পদবী আগে নাম পরে - এই ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। এটি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন প্রদীপ চৌধুরী। যদিও মুদ্রকের নাম ছাপানো যায় নি। কোনো প্রেসই ছাপতে রাজীও হচ্ছিল না পত্রিকাটি। লেখার ধরণ ধারণ দেখেই হয়তো বা। কিন্তু ছাপানো হলে

কফি হাউসে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, কবি লেখকদের আড্ডাখানায়, রেঁস্তোরায় ইত্যাদি নানা স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হল এই পত্রিকা। মলয় বলেছেন, "আমি তখন পাটনায়। কলকাতায় কফি হাউসে আর অন্যান্য জায়গায় সুবিমল, শৈলেশ্বর, প্রদীপ, বাসুদেবরাই বিলি করলেন।'[১৫] প্রতিক্রিয়া হল মারাত্মক। মলয় জানিয়েছেন,

> "জোড়াবাগান থানায় ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ রাত্তির ৯টা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে এফ. আই আর রুজু করেন লালবাজারের প্রেস সেকশনের সাব ইন্সপেক্টর কালীকিংকর দাস। লেখায় অশ্লীলতা ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। অভিযুক্ত ঐ সংখ্যার প্রত্যেকে এবং প্রকাশক। মোট এগারোজন। এফ. আই আর নটা পঞ্চান্নতে রুজু হলেও, ওই দিন সকালেই পুলিশ গ্রেফতার করে সুভাষ ঘোষ ও শৈলেশ্বর ঘোষকে, তাদের ঘর তছনছ করা হয়, বইপত্তর ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়। প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়, পাড়ায় হমবি তমবি করা হয়, আমহার্স্ট স্ট্রীট লক আপে অজস্র চোর ছ্যাঁচোরদের সঙ্গে পুরে দেওয়া হয়। ... এরপর গ্রেপ্তার হন দেবী রায়, বর্ধমানে। তাঁর ঘরও তছনছ করা হয়। .... কলকাতার দুই সাব—ইন্সপেক্টর সুরেন্দ্রমোহন বারড়ি ও অমল মুখার্জ্জী পাটনা পুলিশের সাব ইনস্পেকটর কৃষ্ণকুমার সিনহাকে সঙ্গে এনে আমাকে আমার আপিস থেকে গ্রেপ্তার করেন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, দু জনে দুহাত ধরে এবং একজন পিঠের দিকে জামা খামচে ধরে।"[১৬ক]

এর পরে পাটনায় গ্রেপ্তার হন সমীর রায় চৌধুরী। ত্রিপুরায় প্রদীপ চৌধুরী গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করলেও পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় আনা হয়। এই প্রথম সাহিত্য করার অপরাধে বঙ্গদেশের ক'জন তরুণকে হাজতে বাস করতে হয়। সমকালীন পত্র পত্রিকার পাতায় এই সব উত্তেজনার বিবৃতি পাওয়া যায়।[১৬খ] ৩রা সেপ্টেম্বর 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'য় সংবাদ এ রকম ঃ অশ্লীল রচনার দায়ে স্কুল শিক্ষক গ্রেপ্তার এবং তার ঘর থেকে অনেক অশ্লীল বই পুলিশ উদ্ধার করেছে।

একই দিনে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় খবরের শিরোনাম এ রকম ঃ TWO HUNGRY GENERATION WRITERS ARRESTED. খবরের শেষে ঐ দুজন সম্পর্কে লেখা হয় 'They are said to belong to a New School of Poetry Calling themselves,

'The Hungry Generation.' 'যুগান্তর' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভ এরকম ঃ যে ক্ষুধা জঠরের নয়।' ফলে কলেজ ষ্ট্রীট কফি হাউসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে আর কেউ যেতে চান না। অনেকে কলকাতার বাইরে চলে যান। এদিকে বোম্বাইয়ের BLITZ একটি সুপরিসর প্রতিবেদন বার করে ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সালে। শীর্ষনাম দেয় ঃ EROTIC LIVES AND LOVES OF HUNGRY GENERATION এই রচনায় প্রদীপ চৌধুরী ও সুবো আচার্যের কলকাতার দিনলিপির বর্ণনা দিয়ে হাংরি আন্দোলনকে উচ্চকিত করা হয়। বাংলা কাগজগুলির নিন্দামন্দের বিপরীত ব্যাপারগুলি ঘটে চলে ইংরাজি পত্রিকাগুলিতে। এমনকি কলকাতার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকাতেও। বিশেষ প্রভাব ফেলে TIME পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে। এটি বেরোয় ২০শে নভেম্বর ১৯৬৪ সালে। শীর্ষনাম থাকে ঃ India : The Hungry Generation. পত্রিকাটির একটি মন্তব্য এখন খুবই মজার মনে হয় — "... five scurffy young poets were hauled into calcutta's Bank Shall court for publishing works that would have melted even vatsayana's pen The Hungry Generation had arrived." 'টাইম' পত্রিকা হাংরিদের অ্যালেন গীনসবার্গের প্রভাবজাত বলেও ঘোষণা করে। যাই হোক, এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রচার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের চাপ সরকারের উপর পড়ে। উক্ত কাগজগুলো ছাড়াও 'দর্পণ', 'জনতা', 'সপ্তাহ', LINK, ধর্মযুগ, প্রভৃতি কাগজে হাংরিদের নিয়ে নানা ধরণের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এভাবে সমস্ত ১৯৬৪ সাল হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের একটি তুঙ্গ বিন্দু হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ক্লাইম্যাকস বললে, ১৯৬৫ সালকে বলতে হয় De-nouncement : পুলিশী হস্তক্ষেপের কারণে আন্দোলনকারীদের সংঘ ভেঙে যায়। 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকার ৮ম সংখ্যার দশজন লেখক এবং প্রকাশক সমীর রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হলেও শেষ পর্যন্ত মলয় রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধেই মামলা চলতে থাকে। অভিযোগ দায়ের হয়েছিল জোড়াবাগান থানায়। P. S. Case NO. 360 dated 2.9.64 U/S 120B / 292 PC. অভিযোগ হচ্ছে ঃ Entering into a criminal conspiracy for an Unathorised publication to wit a book l et. Hungry Generation and thereby continued its circulation to corrupt the minds of the common reader. মলয় লিখেছেন, ''মলয় দেবী সুভাষ, প্রদীপ, সমীর, শৈলেশ্বর, সুবিমল, রামানন্দ, সুবো, উৎপল এবং বাসুদেবের নামে অ্যারেষ্ট ওয়ারেন্ট বের হয় ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১২০বি এবং ২৯২ ধারা ভাঙবার দরুণ। গ্রেপ্তার হন প্রথম ছয় জন। হাত কড়া পড়িয়ে কোমরে দড়ি বাঁধা হয় আমাদের। সকলের চাকরিতে টানাটানি আরম্ভ হয়।''[১৭] ফলে, ১৯৬৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর আলিপুর

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ৯ নং কোর্টে উক্ত অষ্টম সংখ্যা হাংরি জেনারেশন পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত মলয়ের 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটির জন্য শাস্তি ঘোষণা করা হয়। মলয় রায় চৌধুরীর জরিমানা হয় দু'শ টাকা, অনাদায়ে একমাসের জেল। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসের ২৮ তারিখ মলয় কলকাতা হাইকোর্টে রিভিশন আপিল করলে ১৯৬৭ সালের ২৬ শে জুলাই উচ্চতর আদালত নিম্নতর আদালতের রায় বাতিল ঘোষণা করে মলয়কে বেকসুর খালাস করে দেন। মলয় বলেন, 'তার পরদিন থেকে আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিই এবং ক্রমশ নিজেকে একাকীত্ব দিয়ে ঘিরে ফেলি।'[১৮] ডঃ উত্তম দাশ বলেছেন, 'মলয়ের এই বিবৃতি সম্পূর্ণ সত্য নয়। হাইকোর্টের রায়ের পরেও মলয় দু'সংখ্যা হাংরি জেনারেশন বের করেছিলেন। কিন্তু ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক আর জোড়া লাগেনি। ১৯৬৮ সাল থেকে মলয়ের স্বেচ্ছানির্বাসন। প্রায় ষোল বছর মলয়ের অজ্ঞাত বাসের কাল। ১৯৮৪ সালে মলয় পুনরায় ফিরে এলেন লেখার জগতে।'[১৯]

এ প্রসঙ্গে মলয়ের বিশ্লেষণ এরকম ঃ

> "..... আমি মনে করি ১৯৬৫ সনের মে মাসের তিন তারিখ হাংরি আন্দোলন প্রকৃত অর্থে ভেঙে যায়। কেননা, সেই দিন ব্যাংকশাল কোর্টে আমাকে যে চার্জশিট দেয়া হয়, তার সঙ্গে হাংরিদের দেয়া জবানবন্দীগুলি জনা জানি হয়ে যায়। তারপর আন্দোলনকে কিছুদিন আমি হিঁচড়ে নিয়ে যাই, কিছুদিন শৈলেশ্বর, কিছুদিন সুবিমল বসাক, তারপর তুমি। হাংরি আন্দোলন এবং হাংরিয়ালিজম দুটো আলাদা ব্যাপার, এটা তো জানো? তেসরা মে ১৯৬৫ এর পর আন্দোলন মুভ করে না, ফলে মুভমেন্টও থাকে না, যা থাকে তা ভরবেগ। ... আমি বলব তুমি একজন হাংরিয়ালিষ্ট হাংরি আন্দোলনকারী নও।'[২০]

এ সব থেকে বোঝা যায়, মলয় হাংরি আন্দোলনের উত্তুঙ্গ অবস্থাটুকুর পরের পর্যায় গুলিকে আর আন্দোলন বলতে রাজী নন। হাংরি চেতনার ক্রমপ্রসারণ হিসেবেই ঐ স্তরগুলোর বিন্যাস করতে চান তিনি। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রয়েছে। বিশেষত ১৯৬৫ সালের পরই যখন হাংরি সাহিত্যের মূল্যবান রচনাগুলি আমরা লাভ করছি এবং আন্দোলনের প্রভাব ক্রমে উভয় বঙ্গ ও ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে বাসুদেব দাশগুপ্তের বক্তব্য মলয়ের বিপরীতে যায়। আর তা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গতও বটে। বাসুদেব বলেন,

> ১৯৬৫ সালকে বলা যায় হাংরি জেনারেশনের প্রতিষ্ঠার বছর। কারণ ঐ বছরেই হাংরি জেনারেশন লেখকদের গ্রন্থগুলো পর পর প্রকাশিত

হতে থাকে। ১৯৬৫ সালের জুন মাসের মধ্যে মলয়ের 'মৃত্যুমেধী শাস্ত্রী', 'আমার অমীমাংসিত শুভা', 'জখম', প্রদীপ চৌধুরীর 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি', 'চর্মরোগ', সুভাষ ঘোষের 'আমার চ'বি' বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা', সুবিমল বসাকের 'ছাতামাথা' প্রকাশিত হলে হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয় মলয় রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'জেব্রা' প্রথম সংকলন। ঐ সংকলনে আমাদের সকলের লেখাই ছিল, বাদ পড়েছিলেন দেবী রায়, আর দুটি নতুন নাম যুক্ত হয়েছিল ত্রিদিব মিত্র ও তপন দাস। ঐ বছরই শারদীয়া 'দেশে' প্রকাশিত হয় সমরেশ বসুর উপন্যাস 'বিবর'।[২]

শুধু এটুকু নয়, ১৯৬৫ সালে সুবিমল বসাক বার করেন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' পত্রিক'। ওতে হাংরি অনেক কবি লেখকরাই লিখতে শুরু করেন। ১৯৬৫ সালেই কৃষ্ণ গোপাল মল্লিক তাঁর পত্রিকা 'গল্প কবিতা'র সূত্রপাত করেন। এই পত্রিকায় শুধু হাংরিদের লেখা নয়, হাংরিদের উপর সত্য গুহের আলোচনাও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৫ সালেই ফাল্গুনী রায় হাংরি আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৮১ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধিস্থানীয় হাংরি কবি। তাঁর সাহিত্য চর্চা ছাড়াও, জীবনযাপন প্রণালী ছিল বিচিত্র যা এই রাজ্যে এখনও একটি মিথ হয়ে আছে। সুতরাং ১৯৬৫ সালেই আন্দোলন ভেঙ্গে গেছে এ কথাটি আংশিক সত্য মাত্র। বরং ভাঙনের পরও তা নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে আশির দশক পর্যন্ত হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের নানা রূপ, স্তর ও বিকাশ তাই লক্ষ করা গেছে। সাহিত্য বিচার পর্বে এই গোটা সময়সীমাকেই আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

তথ্যসূত্র

১. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃ - ৮।

২. তদেব পৃ ৯।

৩. তদেব পৃ ১০।

৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ১৭।

৫. তদেব।

৬. তদেব, পৃঃ ১৮।

৭. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪ পৃ ৮।

৮. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ৩৯।

৯. বাসুদেব দাশগুপ্ত, চিঠি, তদেব, পৃ ১২৪।

১০. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী। কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ ঃ ৬১।

১১. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ ২৯-৩০।

১২. বাসুদেব দাশগুপ্ত, চিঠি, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৪।

১৩. শৈলেশ্বর ঘোষ, তদেব, পৃ ঃ ৪৩।

১৪. অন্নদা শঙ্কর রায়, মুখবন্ধ, সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০০। পৃঃ -০।

১৫. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুকস্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪ পৃ ঃ ৩৭।

১৬ক তদেব, পৃঃ ৩৮।

১৬খ. উল্লিখিত রিপোর্টগুলির কিছু অংশ গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হল।

১৭. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি আন্দোলন ঃ পিছন ফিরে দেখা, জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, ১৯৯২, কলকাতা, পৃঃ ৬৫।

১৮. তদেব, পৃঃ ৬৬।

১৯. উত্তম দাশ, ক্ষুধিত প্রজন্ম ঃ বিদ্রোহ না সন্ন্যাস, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকতা, ২০০২, পৃ ঃ ১৪৮।

২০. মলয় রায়চৌধুরী, অরুণেশ ঘোষকে সাক্ষাৎকার, জিরাফ পত্রিকা, কোচবিহার, ১৯৮৫, পৃ ঃ ১৩।

২১. বাসুদেব দাশগুপ্ত, চিঠি, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ ১১৯।

পঞ্চম অধ্যায়

আন্দোলনের পরিণতি পর্ব

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের বিস্তার ও পরিণতির ক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যাপার অনুধাবণযোগ্য। প্রথমতঃ হাংরি জেনারেশন বুলেটিন ও পত্রিকার অবলুপ্তি। রাষ্ট্রীয় দমন জনিত কারণেই তা ঘটে কিন্তু অন্য নামে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রকাশ এবং সেগুলিতে ঐ একই কবি লেখকেরা অংশ গ্রহণ করেন ; কিছু কিছু নতুন কবি, লেখকও অংশ গ্রহন করেন। দ্বিতীয়তঃ অনেক লেখক এই আন্দোলন থেকে বার হয়ে যান । কেউ কেউ পুলিশের ভয়ে, অথবা আনন্দবাজার যুগান্তরের মতো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার ইচ্ছায়। যথা শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উৎপল কুমার বসুর মত কেউ কেউ চলে যান বিদেশে। বিনয় মজুমদার, শম্ভু রক্ষিতের মতো কেউ কেউ নির্দিষ্ট কোনো পত্রিকা বা গোষ্ঠীতে যোগ না দিয়ে, স্বাধীনভাবে ছোট খাটো নানা পত্রিকায় লেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। শক্তি, সন্দীপন বিনয়, সুবো আচার্য, অরনি বসুর মতো অনেকেই কৃত্তিবাস পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। সুবো আচার্য হাংরি আন্দোলনের মধ্যেও সমান্তরাল ভাবে থেকে যান । তৃতীয়তঃ মকদ্দমার কারণে আন্দোলনের সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের পারস্পরিক বিশ্বাসে চিড় ধরে - সম্পর্কের বাঁধন আর থাকে না। আন্দোলনের অন্যতম নায়ক মলয় রায় চৌধুরী সাহিত্য জগৎ থেকেই নির্বাসন নিয়ে পাটনায় গিয়ে নতুন দাম্পত্য শুরু করেন। তাঁর মনে হয়, সাহিত্যের চেয়ে জীবন, বিশেষত অর্থ সম্পদ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মোট এগারোজন অভিযুক্ত হলেও, প্রাথমিক স্তরেই বাকী দশজন মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় এবং একমাত্র মলয়ই সোপর্দ হওয়ায় ভয়ংকর একাকীত্বের বোধ তাঁকে গ্রাস করে। মোট কথা, আন্দোলন থেকে বিছিন্ন হয়ে যান তিনি। চতুর্থতঃ আন্দোলনটি কেন্দ্রাভিমুখীনতা থেকে বিচ্যুত হয়। শৈলেশ্বর, বাসুদেব সুভাষ, প্রদীপ একদিকে একটি অবিন্যস্ত আন্দোলন পরিচালনা করেন, অন্যদিকে সুবিমল বসাক, দেবী রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁদের পত্রপত্রিকায় সমধর্মী লেখকের লেখা ছাপাতে থাকেন। আন্দোলনের প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষ হতে থাকে ক্রমশঃ। তখন উঠে আসে অন্য এক তরুণ সম্প্রদায়, তাঁরা হাংরি আন্দোলনের নতুন প্রজন্ম। গড়ে ওঠে অন্য এক ইতিহাস।

যাইহোক, হাংরি জেনারেশন পত্রিকা উঠে যাবার পর এবং নিঃসঙ্গ মলয় রায় চৌধুরীর মামলা চলাকালীন প্রথমে তাঁরই পত্রিকা 'জেব্রা' এবং সুবিমল বসাকের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ১৯৬৬ সালে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র দ্বিতীয় সংকলন বার হয়। ১৯৬৭ সালে মলয়ের 'জেব্রা' পত্রিকার দ্বিতীয় এবং শেষ সংকলনটি বেরিয়ে যায়। ১৯৬৮ সালে 'হাংরি' জেনারেশন স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত' পত্রিকাটি বার হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক বাসুদেব দাশগুপ্ত। ত্রিপুরায় প্রদীপ চৌধুরীও তাঁর পত্রিকা 'ফুঃ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি বার করে ফেলেন। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলন ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত হয়, সেখানে সম্পাদক সুভাষ ঘোষ। তৃতীয় সংকলন ১৯৭৫ সালে, সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী। চতুর্থ সংকলন ১৯৭৭ সালে, সম্পাদক শৈলেশ্বর ঘোষ, পঞ্চম সংকলন ১৯৭৮ সালে, সম্পাদক শৈলেশ্বর ঘোষ। ৬ষ্ঠ সংকলন 'ক্ষুধার্ত' ১৯৮১ সালে শৈলেশ্বরেরই সম্পাদনায় বার হয়। সপ্তম সংখ্যার সম্পাদকও তিনিই, প্রকাশকাল ১৯৮৪। উল্লেখ্য যে, এখানে শৈলেশ্বরের কবিতার উপর মলয় রায় চৌধুরী লিখেছিলেন প্রবন্ধ। এরপর আর 'ক্ষুধার্ত' বেরোয়নি। শেষ সংখ্যা 'ক্ষুধার্তে'র শেষতম লেখাটির মলয় রায় চৌধুরীর। একটা জিনিস বোঝা যায়। তখনও পর্যন্ত শৈলেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। সুতরাং সরকারী মামলায় একক অভিযুক্ত হওয়ার অভিমানই মলয়ের নিঃসঙ্গ হবার কারণ নাও হতে পারে। ১৯৮৪ সালেই শিবনারায়ন রায় তাঁর 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার কার্ত্তিক পৌষ সংখ্যায় অবশ্য লিখেছিলেন, ''পাটনায় ছেলে মলয় এখন লক্ষ্ণৌতে বাস করেন। অভিমান করে দীর্ঘকাল তিনি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন।'' মলয় বলেছেন যে .....

> আমি লেখা ছেড়ে দিই -বা লেখা আমাকে ছেড়ে দেয় - সম্পূর্ণ অন্য কারণে। মামলার গন্ডগোলের মাঝে আমার জীবনে একের পর এক নানান ঘটনা ঘটতে থাকে। সে সব এত ব্যক্তিগত যে, তার গোপনতাই যেন সুস্থতা মনে হয়। সেগুলো গোপন রাখার মধ্যে একাকীত্বের ভালো লাগা আছে .... যতটুকু মনে করতে পারি,জুলাই ১৯৬৭ এ হাইকোর্টে মকদ্দমা জিতে যাবার পর আর কোনও লেখা লিখিনি। লেখার জন্য স্থির হয়ে বসার মানসিকতা ছিল না।অস্তিত্বের অদম্য অস্থিরতায় আমি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলুম। ১.

তবে, মলয়ের লেখা থামানোর সঙ্গে সঙ্গেই হাংরি জেনারেশন আন্দোলনটি শেষ হয়ে যায় এ যুক্তি ধোপে টেকে না। বিশেষ করে তাঁর লেখা ছেড়ে দেবার কারণটি যেখানে অনেক খানি ব্যক্তিগত। এটা ঠিক যে, শেষ পর্যন্ত মলয় একাই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র বল্লভ, সমীর বসু, প্রমুখেরা রাজসাক্ষী হয়েছিলেন, পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিয়েছিলেন - ইতিহাস সে কথাই বলে। যদিও পুলিশের জবানবন্দী পুরো গ্রহনযোগ্য নয় বলে চার্জশীট গঠন হবার পর সে গুলিকে চ্যালেঞ্জ করা যায়।মলয় লিখেছেন, ''দেবী রায় মুচলেকা লিখতে অস্বীকার করেছিলেন, সম্ভবত তাঁর সাব অল্টার্ন বোধের দরুণ। বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবো আচার্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সে সময়ে অ্যাবসকন্ড করেছিলেন বলে এজাহার দিতে হয় নি।''২ লক্ষণীয়, শৈলেশ্বর ও সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখ হাংরি সাহিত্যিকরা ছাড়াও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল প্রমুখ কবিরা আদালতে জোরালো ভাবেই মলয়ের কবিতার সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন - যার ফলে তিনি অভিযোগ মুক্ত হতে পেরেছিলেন। সুতরাং সতীর্থদের সঙ্গে মলয় রায় চৌধুরীর সম্পর্ক তখনও চরম তিক্ত স্তরে যায় নি। তাই ৭ম সংকলনের 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় শৈলেশ্বরের কবিতার উপরে প্রবন্ধ লিখতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। আসলে ঐ ১৯৮৪ সালেই 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় 'হাংরি আন্দোলন পিছন ফিরে দেখা' প্রবন্ধটি বার হবার পর শৈলেশ্বর, সুভাষ, বাসুদেবদের সঙ্গে মলয়ের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রে মলয়ের 'হাংরি কিংবদন্তী' স্মৃতি চিত্রণ ধারাবাহিক শুরু হলে এবং ১৯৯৪ সালে তা দে বুক ষ্টোর থেকে গ্রন্থাকারে পরিবেশিত হলে উক্ত সর্ম্পকের চূড়ান্ত অবনমন ঘটে। শৈলেশ্বর বলেছেন, মলয় সত্যের অপলাপ করেছেন, প্রচারের লালসায় নিজেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের স্রষ্টা বলছেন। বাসুদেব দাশগুপ্ত বলেছেন, ''১৯৬৫ সাল থেকেই আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি হাংরি জেনারেশন বলতে মলয় রায় চৌধুরী শুধু নিজেকেই বোঝাতে চাইছেন।''৩

এক দিক থেকে শৈলেশ্বর, বাসুদেবদের অভিযোগ ঠিক, অন্যদিক থেকে মলয়েরও এরকম ভাবনার পিছনে কিছু যুক্তি আছে। কারণ আন্দোলনের মূল পরিকল্পনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাছাড়া আদালতের চূড়ান্ত লাঞ্ছনাও তো তাঁকেই একা ভোগ করতে হয়েছে। সতীর্থরা যে সে ভাবে মলয়ের পিছনে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন - তেমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে না। তবু অসীম আত্মত্যাগের পাশাপাশি মলয়ের স্বেচ্ছানির্বাসনও বেমানান। তাঁর কারণ যাই হোক না কেন। আন্দোলনের দাবি, নেতার যোগ্যতার কাছে অন্য রকমই প্রার্থিত ছিল। যেমন প্রার্থিত ছিল সতীর্থদের সংঘবদ্ধ সহযোগিতা। শিবনারায়ন রায় ঠিকই বলেছেন,-

> শহীদ হওয়া শিল্পীদের দায়িত্ব নয়; কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ এবং বিপন্ন বন্ধুর প্রতি আনুগত্য না থাকলে কোনও আন্দোলনই শক্তি অর্জন করতে পারে না। শিল্পকৃতির জন্য আন্দোলন জরুরী নয়, শিল্পী ও ভাবুকদের মধ্যে অনেকেই নির্জনে সাধনা করবার পক্ষপাতী। কিন্তু কোনও আন্দোলন - শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে হোক আর জীবনের জন্য বিন্যাসেই হোক - প্রভাব ফেলতে পারে না, যদি না সেই আন্দোলনে যাঁরা অংশভাক তাঁরা সৎ, নীতিনিষ্ঠ এবং পরস্পরের কাছে নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হন।৪

এসব কারণে বলা যায়, ১৯৬৫ সালের পর হাংরি জেনারেশন আন্দোলন গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে যায়। বিশেষতঃ মলয় রায় চৌধুরী এই আন্দোলন থেকে বিছিন্ন হয়ে যান। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার একাধিক সম্পাদক বদল থেকে এ ইঙ্গিতও আসে যে এই আন্দোলনটি আর কোনো একক ব্যক্তির হাতে থাকবে না। অরুণেশ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অন্দোলনের এই পর্বান্তরগুলোকে মলয় একেবারে অস্বীকার করেননি। মলয়ের 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সুবিমল বসাক লিখেছেন,-

> মকদ্দমা চলাকালীনই আমাদের নিজেদের মধ্যেও সুসম্পর্ক নষ্ট হতে থাকে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। ডোমিনেট করার প্রবণতা দেখা দেয় .....আমরা প্রত্যেকে এই অবস্থার জন্য সমান দায়ী। মলয় হয়তো ভেবেছিল, সে থেমে যাওয়ায় আন্দোলন থেমে যাবে... কিন্তু আন্দোলন থামে নি। আন্দোলন থেমে থাকে না। নেতৃত্বও কখনও কারো পায়ের কাছে গেড়ে বসে না। যে আন্দোলন এত গভীর ভাবে আমাদের রক্তে মিশে গিয়েছিল, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। হাংরি জেনারেশন একটি পরিকল্পিত সাহিত্য আন্দোলন। প্রত্যেকটি বিষয়ের ম্যানিফেষ্টোকে সামনে রেখেই সকলেই নিজস্ব হাতিয়ার তুলে ধরেছিল।

> সকলেরই জীবন ছিল আলাদা; নিজস্ব জীবন,
> নিজস্ব বোধজাত রচনায় কোন রকম ভেজাল ছিল না।
> এদিকে এই আন্দোলন তারপর লাগাতার এগিয়ে নিয়ে
> যায় বাসুদেব শৈলেশ্বর, সুভাষ, প্রদীপ, ত্রিদিব অনেকে।
> ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত খবর, ফুঃ স্বকাল, প্রতিদ্বন্দ্বী, উন্মার্গ এই
> সব পত্রিকা বেরোতে থাকে।৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'ক্ষুধার্ত' খবরের সম্পাদক ছিলেন সুভাষ ঘোষ, 'উন্মার্গে'র ত্রিদিব মিত্র। এছাড়া ১৯৬৭ সালে শৈলেশ্বর ঘোষের সম্পাদনায় 'ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ' বার হয়েছিল। দেবী রায়ের 'চিহ্ন' বার হয়েছিল ষাট দশকেরই মধ্যে। মোটকথা, আন্দোলনের ঘনীভূত অবস্থা আর রইল না। এরই মধ্যে শৈলেশ্বর, সুভাষ ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত, ফাল্গুনী রায়, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্যেরা আশির দশকের শেষ পর্যন্ত যূথবদ্ধ রইলেন। পরে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্তব্ধ হয়ে গেলেও তাঁদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব রচিত হয় নি। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাও অটুট ছিল ও আছে। ছিল বলার কারণ, ইতি মধ্যেই ফাল্গুনী রায়, সুভাষ ঘোষ ও বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে একমাত্র প্রদীপ চৌধুরী ছাড়া বাকিদের সঙ্গে মলয় রায় চৌধুরীর সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে। একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, সুবিমল বসাক, দেবী রায়, মলয় রায় চৌধুরী মিলে একটি গোষ্ঠী। হয়তো সে কারণে, 'হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলনে' এঁদের রচনাকর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়নি বা পাওয়া যায় নি। কিন্তু দেবী রায়ের সঙ্গেও মলয়ের সম্পর্ক আর উষ্ণ নেই। ধানবাদ থেকে প্রকাশিত অজিত রায়ের 'শহর' পত্রিকায় এক জায়গায় দেবী রায় লিখেছেন,-

> পরমত সহিষ্ণুতা বলে একটা শব্দ আছে, মলয়কে তা
> নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পরামর্শ দিই ..... মলয় এক
> জায়গায় লিখেছেন হাংরি আন্দোলনকারী হিসেবে যাঁরা
> পরে খ্যাত হন, এঁদের কারুর সঙ্গে অ্যালেন গীন্সবার্গের
> আলাপ হয় নি। কথাটি মলয় ঠিক লেখেন নি। .... মলয়
> এ রকম একজায়গায় লিখেছেন। '.....এন (Debi
> Roy) has no knowledge of world
> literature, 'He belongs to lower caste. ....
> যিনি স্রষ্টা হিসেবে নিজেকে এতো সিরিয়াস ভেবে থাকেন,

সেই তিনিই কিভাবে আরেক জনের সম্পর্কে শালীনতা বিসর্জন দিয়ে কেন যে নিছক, মুখরোচক কিংবদন্তী লেখেন ?

মলয়ের স্ত্রী সলিলা রায় চৌধুরী তাঁদের বিবাহ উত্তর দাম্পত্যের বর্ণনায় সাহিত্যচর্চা নিয়ে বলেছেন, ''মলয়ের বন্ধুবান্ধব দেখিনি বড় একটা। সাহিত্যিক দু-একজন দেখা করতে চাইলেও এড়িয়ে যেত। বেশ খেপে ছিল বন্ধুদের উপর। সুবিমল বসাক কয়েক বার এসে নন্দার চায়ের দোকান থেকে মলয় মলয় বলে ডাক পাড়ত, তবুও সাড়া দিত না'' ৬ সুবিমল বসাকের জবানীতেও একই ছবি,-

> তারপর পাটনায় যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে, ভুলেও সে কখনও সাহিত্য সর্ম্পকে, বন্ধুবান্ধব সর্ম্পকে, লেখালেখি সর্ম্পকে উল্লেখ করেনি। শুধু, একদা প্রসঙ্গত বলেছিল - মানুষ রুটির জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। মলয় তখন ঘোর সংসারী, সন্তানের পিতা, সফল স্বামী, দায়িত্বশীল অফিসার - পরিপূর্ণ জমাটি। জীবনের ভিন্ন আশ্রয় বলে তখন আর কিছু নেই, দেখে মন খুব দুঃখিত হয়ে পরে আমার। আমিও মলয় সর্ম্পকে ক্রমশ: আগ্রহ হারিয়ে ফেলি।৭

এসব থেকে একটি জিনিস স্পষ্টতা পায়, মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের স্রষ্টা হতে পারেন, কিন্তু নেতৃত্বের জন্য যে ধৈর্য্য, ত্যাগ, একাগ্রতা প্রয়োজন ছিল সে সবের কোনোটাই তাঁর ছিল না। অথবা তিনি নেতা হতেই চাননি। সেই জন্যেই কি প্রথম ইস্তাহারে নেতা হিসেবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম দিয়েছিলেন ? সেই জনেই কি ১৯৮২ সালে মায়ের মৃত্যুর পর পুনরায় লেখালেখির জগতে ফিরে এসে মলয় রায়চৌধুরি আর নিজেকে হাংরি ঘরানাতেও বাঁধতে চাননি ? নিজেকে বলেছেন অধুনান্তিক সময়ের সদস্য ? বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মলয় বলেছেন,-

> আমি নিজেকে এখন হাংরি বলে মনে করি না। হাংরি শব্দটা আমার ঘাড়ে চেপে বসে আমার লেখা লেখির পক্ষে অসুবিধে আরম্ভ করেছে। ..... আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠান বিরোধীও বলতে চাই না।

আমি মলয় রায়চৌধুরী। আমার ভাবনা চিন্তার জন্যে প্রতিষ্ঠানই আমার বিরোধিতা করে। শম্ভু রক্ষিত, দেবী রায় অরণি বসু, উৎপল কুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এঁরা যেমন হাংরি শব্দটাকে ঝেড়ে ফেলেছেন আমিও তা-ই চাই। আমি মলয় রায় চৌধুরী হিসেবে পরিচিত হতে চাই। যাঁরা মনে করেন হাংরি আন্দোলন চলছে, তাঁরা চালিয়ে যান। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াতে থাকুন। যা ইচ্ছে করুন, তাঁদের বিষয়ে ভাবার সময় আমার হাতে আর নেই।৮

এই জায়গায় শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে মলয়ের দুস্তর ব্যবধান। শৈলেশ্বরের কাছে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন একটি সামাজিক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আন্দোলন। এর একটি স্বকীয় চারিত্র্য আছে - যা থেকে শৈলেশ্বরেরা কখনই ভ্রষ্ট হতে চান নি। অতএব মলয় ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে শৈলেশ্বর লেখেন -

'যা সে নয় তাই নিজেকে সাজাতে গিয়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। তবে তাঁর এই বিদায়, হাংরি আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র বিচারে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। হাংরি আন্দোলনকে আমরা যথার্থ প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলনের দিকেই ঠেলে দিয়েছিলাম। বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সত্রপাত সেই সময়েই ঘটে। মলয় স্ববিরোধিতার জালে আটকে পড়ে। তাঁর বিদায় আমাদের আন্দোলনকে সুস্থ চরিত্র দিতে সাহায্য করেছিল। এর পরের ২৫ বছর অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া গেছে।৯

এবং

> একজন লেখকে সারাজীবন ধরে অসম্ভব কষ্ট, ত্যাগ এবং ধৈর্যের মধ্য দিয়ে নিজের রচনাকে এবং চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতাকে সত্য করে তুলতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল আরও ভয়ংকর, কারণ আমাদের কথা ও কাজের দিকে সকলের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। হাংরি সাহিত্য বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এবং মলয়ের বক্তব্যের মধ্যে একটা বিরোধ প্রথমেই তৈরি হয়েছিল। সে লিখেছিল, অবক্ষয়ের নির্বিচার দ্বিধাহীন আত্মসাৎ প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্যই' ১০ এই সাহিত্য। আমাদের কাছে এটা দাঁড়ায় বস্তু সমুহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ।১১

দুটো বক্তব্যের গতিপথ সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি তাই হয়, তবে তো আন্দোলনের ভাঙন অনিবার্য। বাস্তবে ব্যাপারটা তা নয়, দু-জনের মধ্যেই প্রচলিতের বিরুদ্ধতা ছিল। বরং মলয়ের মত দিয়ে শৈলেশ্বরের কবিতা এবং শৈলেশ্বরের দৃষ্টিকোণ দিয়ে মলয়ের কবিতা বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সহজতর। সুবিমলের পূর্বোক্ত কথাই ঠিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ছিল। পুলিশ, আদালত, চাকুরি ও সামাজিক আশ্রয়াভাব মধ্যবিত্ত বাঙালী কবি লেখকদের ভীত, সতর্ক ও সন্দেহপ্রবণ ও করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে সমীর রায় চৌধুরীর ভাবনা যথার্থ,-

> তবে আমার মনে হয় মামলায় এজাহার ও সাক্ষ্য দুই স্তরে শৈলেশ্বর ও সুভাষের ভুমিকা সবচেয়ে সঠিক ছিল। তখন যে জুলুমের পরিবেশ ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে। এরপর হাংরি ব্যাপারটাকে অন্যেরা যেমন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, শৈলেশ্বর, সুভাষ, বাসুদেব, প্রদীপ ও সুবিমল তেমনই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যেমে ক্রমশ আন্দোলনের স্পষ্ট স্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন। ১২

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পরিণতি বিচারে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ব্যক্তিগত কলহকে বাদ দিলেও চলবে। শৈলেশ্বর ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্তেরা এবং প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখেরা নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত যে এই আন্দোলনকে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন সেটা গুরুত্বপূর্ন। এমনকি মধ্যে - সত্তরের নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকেও নিজস্ব ধ্যানধারণায় সমান্তরাল ভাবে তাঁরা যে আন্দোলনটিকে পরিচালিত করেছিলেন তাঁতে এই আন্দোলনের পরিনতিকে ফলপ্রসূই বলতে হবে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. মলয় রায়চৌধুরী, অরুনেশ ঘোষকে সাক্ষাৎকার, জিরাফ পত্রিকা, সংকলন - ১০, কোচবিহার, ১৯৮৫, পৃ: ৩ ।

২. মলয় রায়চৌধুরী, 'এবং' পত্রিকা, ৫৫ সংখ্যা /কলকাতা , ১৯৯৯ পৃ :১০৭ ।

৩. বাসুদেব দাশগুপ্ত, চিঠি, শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ: ১২০ ।

৪. শিবনারায়ন রায়, সম্পাদকীয়, জিজ্ঞাসা, কার্তিক পৌষ ১৩৯১। হাওয়া ৪৯, ২০০১ থেকে সংকলিত, কোলকাতা, পৃ: ২২৬ ।

৫. সুবিমল বসাক, সংযোজন, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কোলকাতা, ১৯৯৪ পৃ: ১১৬-১১৭ ।

৬. সলিলা রায়চৌধুরী, আমার উনি এবং তারপর, হাওয়া ৪৯, কলকাতা, ২০০১, পৃ: ২১১ ।

৭. সুবিমল বসাক, সংযোজন, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কোলকাতা, ১৯৯৪ পৃ: ১১৬ ।

৮. মলয় রায়চৌধুরী, হাংরি সাক্ষাৎকারমালা, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ১৯৯৯ পৃ: ৫৮ ।

৯. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ: ১২০ ।

১০. তদেব পৃ: ৬১ ।

১১. তদেব পৃ: ৬১ ।

১২. সমীর রায়চৌধুরী, বয়ান, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ: ১২৩-১২৪ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্দোলনের উত্তর প্রভাব

ষাটের দশকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন যখন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে - তখন সুদূর উত্তরবঙ্গেও এর প্রভাব অনুভূত হয়। বিশেষ করে ১৯৬৪ সালে মামলায় পর্যুদস্ত হবার ফলে আন্দোলনকারীদের কিছু নিরাপদ আশ্রয়ও দরকার হয়। এই আশ্রয় যতখানি না ব্যক্তির তার চেয়ে পত্রিকার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। প্রদীপ চৌধুরী-ই একমাত্র যিনি ত্রিপুরায় তাঁর স্বগৃহে আত্মগোপন করেছিলেন। নইলে তাঁর সাহিত্য চর্চা চলছিল কলকাতাতেই। যাই হোক, 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকা যখন ১৯৬৮ সালে বন্ধ হয়ে গেল, তখন 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরোলো ১৯৬৯ সালে অশোকনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে। প্রকাশনা ও সম্পাদনা - বাসুদেব দাশগুপ্ত। এরপর এই পত্রিকারই তৃতীয় সংকলন বেরোলো কোচবিহার থেকে। প্রকাশক- অরুণেশ ঘোষ; প্রকাশকাল ১৯৭৫। স্মর্তব্য যে, এক বছর আগেই শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে অরুণেশের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে কলকাতায়। ১৯৭৪ এর মাঝামাঝি 'জিরাফ' পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংকলনে শৈলেশ্বরের 'অপরাধীদের প্রতি' কাব্যগ্রন্থের আলোচনাও করেছিলেন অরুণেশ। এই তথ্যগুলো জীবতোষ দাসের 'রোবট' (১৯৮২) পত্রিকায় অরুণেশ ঘোষের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়। সেখানে অরুণেশ আরও বলেন,-

> 'হাংরিরা প্রচলিত ধারায় লিখতে চায়নি, তাঁরা শিল্প সাহিত্য করার চাইতে জোর দিয়েছে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির দিকে,জীবন ও সত্য অভিজ্ঞতাকে তাঁরা মূল্য দিয়েছে বেশী। ..... জীবনকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল ..... কলকাতা থেকে দূরে বসে ভাবতাম, এ আমারই স্বপ্ন - যা একটা রূপ পেতে চলেছে। ছেলেবেলা থেকে এই স্বপ্নই আমি দেখে এসেছি। অস্থির ও উন্মাদ আমি ছোট শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি একই রকম উন্মাদনা নিয়ে....

> আমি যখনই যাই শৈলেশ্বরের বাড়িতে তখন প্রায় সবাই ধরে নিয়েছে হাংরিরা শেষ হয়ে গেছে। প্রাথমিক উন্মাদনা কেটে যাবার পর সঙ্গে সঙ্গে ঝরে গেছে অনেকেই - যাঁরা রাতারাতি কুখ্যাত হয়ে বিখ্যাত হতে চেয়েছিল। তাঁরাও হতাশ - আর এটাই ছিল আমার কাছে স্বস্তির কারণ ....।১

লক্ষণীয়, অরুনেশ ঘোষের 'জিরাফ' পত্রিকাটি যেন হাংরি জেনারেশন আন্দোলনেরই উত্তরাধিকার বহন করে। সমাজও সভ্যতা সর্ম্পকে 'জিরাফ' পত্রিকা 'ক্ষুধার্ত' বা 'জেব্রা' পত্রিকার বিষয় বিন্যাস ও ভাবনাকে অস্বীকার করে নি। এমনকি লেখক তালিকাতেও হাংরি কবি - লেখকরাই প্রধান। 'জিরাফ' ১০ম সংকলনের শিরোনামে বিশেষণটি ছিল এ-রকম 'ক্ষুধার্ত চেতনার কাগজ'। সম্পাদকীয়তে অরুণেশ লেখেন -

> আজকের যে ক্ষুধার্ত তা মলয়ের হাংরি থেকে আলাদা। .... ক্ষুধার্ত আন্দোলন কিছু সময়ের জন্য থেমেও গিয়েছিল। আবার সে চেতনা সংকট কাটিয়ে, নৈরাশ্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জেগে উঠেছে। যেখান থেকে শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন, স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে আজ আর দাঁড়িয়ে নেই। .... ক্ষুধার্ত স্পিরিটির মৃত্যু হয় নি।২

শৈলেশ্বর ঘোষও লিখেছেন, ''নিজের কিছু লেখা আর 'জিরাফ' পত্রিকা নিয়ে অরুণেশ আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়। ..... মানসিকভাবে সে তখন হাংরি জেনারেশনের অংশীদার। তাঁর লেখায় এর ছাপ স্পষ্ট।''৩ মনে রাখা প্রয়োজন, অরুণেশের 'জিরাফ' পত্রিকার ১০ম সংকলনই শৈলেশ্বর ঘোষ ও মলয় রায় চৌধুরীর বিবাদকে প্রকাশ্যে প্রখর ভাবে নিয়ে আসে। সেখানে অরুণেশ উক্ত দু-জনের দুটি সাক্ষাৎকার ছাপেন। সেটি প্রকাশ পেলে শৈলেশ্বর মলয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া, অরুণেশ নিজেও মলয়কে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন সম্পাদকীয়তে। এই ব্যাপারটি ঘটে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে। একদিক থেকে মনে হয়, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রথম যুগের পর্ব পেরিয়ে যেন আরও সম্প্রসারিত কোনো পর্বান্তর ঘটতে চলেছে। যদিও ১৯৮৫ তেই 'জিরাফ' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

তবে তার প্রভাব থেকে যায় উত্তর বঙ্গের কিছু তরুণ কবিদের মধ্যে।যেমন কোচবিহারেরই জীবতোষ দাসের কথা বলা যায়। জীবতোষ দাসও হাংরি আন্দোলনেরই আরেক সহযোদ্ধা। ১৯৭৫ সালে তিনি প্রথম 'নাড়িভুঁড়ি' পত্রিকাটি বার করেন। ১৯৭৬-এ বার করেন 'রোবট' পত্রিকা। এই পত্রিকাতে হাংরি কবি লেখকদের বহু কবিতা, প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। ১৩ বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া রাজা সরকারের 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প', মনোজ রাউতের 'ধৃতরাষ্ট্র' প্রভৃতি পত্রিকা শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কোচবিহার থেকে অনুভব সরকার বার করেছিলেন 'টার্মিনাস' ইত্যাদি পত্রিকা । এ গুলির প্রত্যেকটি-ই হাংরি কবি লেখকদের আশ্রয়স্থান হয়ে উঠেছিল। পত্রিকাগুলির মূল ভাবাদর্শও ছিল হাংরি ধ্যানধারনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কলকাতায়, এখন এ 'রকম', 'বর্ণ পরিচয়' চন্দননগরে 'দন্দশূক' অশোকনগরে এই 'সহস্রধারা' প্রভৃতি পত্রিকাও হাংরি কবি লেখকদের প্রচুর লেখা প্রাধান্য দিয়ে ছেপেছে। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে লোকমানসে সজীব রাখতে চেয়েছে। শৈলেশ্বর ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,-

> কলেজ ষ্ট্রীটে 'কাগজের বাঘ'কে কেন্দ্র করে একদল তরুণ লেখক 'এখন এ রকম' এবং 'বর্ণ পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। পরিচালনায় ছিল জীবন সাহা, ল্যাডলী মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ সমাদ্দারের মত তরুণ লেখকরা এঁরা হাংরি লেখকদের কাছাকাছি এলেন। তাঁদের কাগজে হাংরিদের লেখা ছাপা শুরু হল এবং তাঁদের দোকানটি বেশ কয়েক বছর আমাদের মেলামেশার ও তরুণদের সাহিত্য ভাবনার কেন্দ্রে হয়ে পড়ে। কলকাতার আরও বেশ কিছু তরুণ কবি লেখক গোষ্ঠী হাংরি লেখকদের কাছাকাছি চলে আসে। এই সময়েই এক ঝাঁক তরুণ হাংরি আন্দোলনে এসে পড়ে। এদের মধ্যে সৈয়দ সমীরণ ঘোষের কবিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমীরন ছাড়া মনোজ রাউত, অলোক গোস্বামী, জীবতোষ দাস, সেলিম মুস্তাফা, অরূপ দত্ত ও রত্নদীপ ঘোষের নাম উল্লেখ করতে হয়।৪

মলয় রায়চৌধুরীও ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। তবে তিনি মনে করেন যে, হাংরি আন্দোলন একটি বিশেষ দেশ-কাল প্রেক্ষিতের ঘটনা। তার পরিসর খুবই ছোট। তাকে বছর বছর ধরে টেনে চলবার কোনো প্রয়োজন নেই। হাংরি আন্দোলন এখন মৃত। হাংরি আন্দোলনের উত্তর প্রভাব বলতে মলয় বোঝেন - একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অভিঘাতের আধুনিক মাত্রাকে। সাহিত্যের ভাবনা ও আকারের একটি নতুন বিন্যাসকে। হাংরি জেনারেশন অন্দোলনকে একটি বিগত ঘটনাবলী হিসেবেই তিনি দেখতে চান। তাই বলেন,-

> তথ্য বিস্ফোরণ আক্রান্ত পুঁজিবলবান অধিবাস্তব বিশ্বে আর কোনো সাহিত্য শিল্প আন্দোলন - পরিবর্তনের দ্রুতির কারণে সম্ভব নয়। বাঙালির উত্তর - আর্দশবাদী সমাজে, নকশাল আন্দোলনের পর যৌথ লোকান্তর সৃজনের ভাবনা নেই বলা যায়। ব্যক্তি প্রজ্ঞা ইউরোপীয় আধুনিকতার মনন সন্ত্রাসে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিক্রয় যোগ্য কৌম নিরপেক্ষ মাল। ছয়ের দশকের আন্দোলনগুলোর সাহিত্য সংজ্ঞার সঙ্গে পরবর্তী কালের সংজ্ঞার মিল নেই, থাকা সম্ভব নয়।৫

তবুও যাঁরা হাংরি ভাবনায় অনুপ্রাণিত তাঁদের সর্ম্পকে মলয়ের প্রতিক্রিয়া এরূপ- ''উত্তরবঙ্গে কিছু কিছু তরুণ, যেমন রাজা সরকার, অলোক গোস্বামী ইত্যাদি হাংরি বিদ্যুতের একটা কনডেনসার তৈরী করতে চাইছে, করুক''।৬ হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের এই দিকটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধু রচনারীতি বা বিষয়বস্তু নয়, একই দৃষ্টিভঙ্গীর একটি আন্দোলন যা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে, এমনকি ত্রিপুরায় পর্যন্ত ছড়াতে পেরেছিল। আর তা শুধু ষাট, সত্তর বা আশি নয়, নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত প্রসারিত। কোচবিহার থেকে নব্বইয়ের দশকেই - সুমিতেশ ঘোষ ও মানস দে'র সম্পাদনায় 'সৃজন' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ পায়, দম দম থেকে অশেষ রায়ের সম্পাদনায় বার হয় 'উদ্বাস্তু' ও সোমা ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'আস্পর্ধা'। এ ছাড়া উত্তর কলকাতার কাশীপুর থেকে অশোক অধিকারী ও সব্যসাচী সেনের 'শব্দভেদী' পত্রিকা। আগরতলা থেকে সাত্ত্বিক নন্দী দু-হাজার সালে 'ক্ষুধার্ত সময়' নামে পত্রিকা বার করে চলেছেন। এগুলির মধ্যে 'শব্দভেদী'র নবম বর্ষ চলছে। কাজেই হাংরি আন্দোলনের উত্তর প্রভাব যে আরও কতকাল বিস্তৃত হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে, হাংরি আন্দোলনের এই উত্তর পর্বে মলয় এবং শৈলেশ্বরের তাত্ত্বিক কড়াকড়ি (rigidity) অনেক কমে এসেছে।

তাই হাংরি আর্দশ কী বা তাকে কিভাবে এই প্রজন্ম ব্যবহার করছেন তা সূত্রাকারে কখনই জানাননি এই নবীন প্রজন্মের কবি , লেখকেরা । কিন্তু ক্ষুধা, ক্ষুধার্ত, হাংরি এ সব প্রসঙ্গ নিয়ে, শৈলেশ্বর, বাসুদেব, মলয় রায়চৌধুরী প্রমুখ পূর্বসূরীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন এই নবীন লেখক সম্প্রদায়। তাঁদের আমন্ত্রিত লেখা ছেপেছেন এঁরা । এমনকি পুরনো রচনারও পুনর্মুদ্রণ করেছেন। এমনকি এই উত্তরসূরীদের মধ্যে মলয় শৈলেশ্বরের গোষ্ঠী বিভাজনের রেশও রয়ে গেছে। যদিও মলয় , বা শৈলেশ্বর কেউই নবীনদের মধ্যে তাঁদের তথাকথিত গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে ছড়িয়ে দেন নি। তবুও যে এরকম হয়েছে তার কারন একেক জনের কাছে মলয়কে বা শৈলেশ্বরকে একেক ভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানের বিরূপতা সত্ত্বেও হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে উত্তর প্রজন্ম কেন গ্রহণ করেছিল তার উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। এটুকু বলা যায় যে, একদিকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের আপোষহীন প্রতিবাদ ও রূঢ় বাস্তবতা, অন্যদিকে তাঁদের সংস্কারহীন ভাষা তরুণ প্রজন্মের কাছে অভিনব ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। উপরন্তু তথাকথিত সাব -অলটার্নের জীবন ও বাচনিকতা এ প্রজন্মের কবি, লেখকেরা যেন প্রথম স্পষ্ট ভাবে হাংরি লেখকদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন। সেজন্যই, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রভাব এত ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছে। আর তা আশ্রয় করেছে মূলতঃ মফঃস্বল অঞ্চলগুলিকেই। এমনকি সুদূর ত্রিপুরার পাবর্ত্য গ্রামাঞ্চলকেও। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের উত্তর প্রভাবের ক্ষেত্রে এটাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য সূত্র ঃ

১. সাক্ষাৎকার, অরুণেশ ঘোষ, রোবট ১৯৮২, দ্রষ্টব্য শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ: ৯২-৯৩।

২. অরুণেশ ঘোষ, সম্পাদকীয়, জিরাফ পত্রিকা ১০ম সংকলন, কোচবিহার, ১৯৮৫, পৃ: ২৭-২৯।

৩. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ: ৯৩।

৪. তদেব, পৃ: ১১১।

৫. মলয় রায়চৌধুরী, (একটি পশ্চিমবঙ্গীয় প্রবলেম্যাটিক; হাংরি আন্দোলন), অব্যয়, শারদীয়া সংখ্যা, কোলকাতা , ১৯৯০, পৃ: ১২০।

৬. মলয় রায়চৌধুরী, হাংরি সাক্ষাৎকারমালা, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ৪৩।